নীল নিঃশব্দ

রমাপদ চৌধুরী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬৪

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ
দেবাশীষ রায়

নীল নিঃশব্দ

তিয়াসার জীবনে অর্কই একমাত্র আনন্দ, একমাত্র সুখ। এমনটা যে হবে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি সে। কিন্তু যা হবার তা তো হবেই। তিয়াসার জীবনেও হয়েছিল এক চরম পরিণতি। হয়তো মানুষ বলবে এ আর এমনকী ঘটনা। সমাজে আজকাল আকছার ঘটছে এসব ঘটনা, চোখ খোলা রাখলেই দেখা যাবে।

যারা ফুরিয়ে গেছে, তাদের কথা বাদ দিলে, যারা এখনো ফুরিয়ে যায়নি, যারা এখনো সমাজকে নতুন পথের দিশা দিতে পারে, যারা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে না, হয়তো আরো পাঁচজনের কথা ভাবে। গোটা সমাজটার কথা ভাবে! তা ছাড়া ক-জন মানুষ আছেন, যারা নিজের কথা ভুলে দেশ ও দশের কথা ভাববে। সময় নেই, কারো সময় নেই। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এত বেশি ব্যস্ত যে, পথচারীর কথা বাদই দিলাম, নিজের বুড়ো বাবা-মাকে দেখবার সময়টুকুও যাদের নেই, তারা দেশ ও দশের কি উপকারে লাগবে, জানি না। তবুও বলব সেই মান-হুঁশ-হীন পৃথিবীতে খুঁজে দেখলে অর্ক সেনের মতো কিছু ছেলেকে এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা নিজের কথা ভুলে সকলের কথা এখনো ভাববার সময় পায়। যাদের পথচলা নীল নিঃশব্দের মধ্যে দিয়ে। তাদের কথা কখনো খবর হয়ে ফেরে না লোকের মুখে মুখে। হারানো প্রাপ্তির বালাই নেই তাদের। তবুও চলে তারা। ওরা কাজ করে, মানুষের অন্তরে-বাহিরে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো পথ করে নেয় নীল নিঃশব্দে। কাজ খুঁজতে হয় না ওদের, কাজ এসে কড়া নাড়ে ওদের দরজায়। ওরা মুখিয়ে থাকে শুধু কাজের আশায়। তাদের মধ্যে একজন হয়ে বেঁচে থাকতে চায় অর্ক। বর্তমান সমাজে যা কিনা অনেকেরই অভিপ্রেত নয়।

সেজন্য অর্ক সেনের চলাফেরার উপর নজর রাখছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল। ছেলেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে নিজের গ্রাম মধুপুরে বাপের কাছে ফিরে এসেছে। গ্রামে ফেরার পর বেশ কিছুদিন চুপচাপ বসেছিল বাড়িতে। সেই কবে গ্রাম ছেড়ে শহরে পা রেখেছিল, আজ আর ভালো করে মনেও পড়ে না তার। অর্কর বাবা গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করতেন। মেধাবী, গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনে পয়সায় পড়াতেন। সেই সুবাদে রঞ্জনবাবুর নামডাক ছিল খুব। এক ডাকে সবাই তাঁকে চিনত। সারাটা জীবন তিনি আদর্শ শিক্ষক হয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন।

তাঁর হাতে তৈরি বহু ছাত্র-ছাত্রী আজকের দিনে বিদেশে গিয়ে ভালো চাকরি করছে। কিন্তু গ্রামে ফিরলে মাস্টারমশাই রঞ্জন সেনকে কেউ ভুলে যায়নি।

এইরকম একজন মহান শিক্ষকমশায়ের ছেলে অর্ক সেন। সে তো বসে থাকার ছেলে নয়। গ্রামে বন্ধুবান্ধব বলতে তেমন কেউ ছিল না। তবুও ছেলেবেলার খেলার সাথিদের সঙ্গে তার ভাব জমিয়ে নিতে বেশি সময় লাগল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের বেশ কিছু ছেলেকে বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়ে গেল। চাকরি-বাকরি করার বেশি একটা ইচ্ছে ছিল না তার। পরের দাসত্ব করতে মন তার সায় দিত না। সে চেয়েছিল বাপের যা কিছু রয়েছে, তা দিয়ে জীবনটা তার দিব্যি চলে যাবে। সেই সময়টা সে দেশগড়ার কাজ করতে গিয়েই অর্ক ভুলেছিল। অর্ক সেন দর্শন শাস্ত্রে এম. এ পাশ করে চাকরি বা গবেষণার কাজে মন না দিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে দেশোদ্ধার করবে বলে। এ-রকম বোকা ছেলে খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু অর্ক সেনের মতো বোকা ছেলে গ্রামেগঞ্জে খুঁজে দেখলে দু-একটা এখনো পাওয়া যেতে পারে। রঞ্জনবাবু মাঝে মধ্যে কারো কারো কাছে ছেলেকে নিয়ে গর্ব করেন। কিন্তু মানসিক শান্তি তিনি পাননি। তিনি আশা করেছিলেন ছেলে তার চাকরি-বাকরি করবে। কিন্তু অর্ক সেন হয়ে গেছে পুরোপুরি উলটো। কোনো বাধাই সে আজ মানে না। কেবলই কাজ আর কাজ। আর গ্রামের কিছু অপোগণ্ড ছেলেরা পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে। এ-হেন বদনামের অভিযোগ তাদের বাবা-মায়েরা বাড়ি বয়ে এসে জানিয়ে গেছে। রঞ্জনবাবু বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গ্রামের বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন যে, অর্ক তার দলবল নিয়ে সারাদিন কি করে।

প্রথমত, তারা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছে। কিছু চেয়ার-টেবিল, একটা স্টিলের আলমারিও কেনা হয়েছে। ওরা ওই ঘরটাতেই বসে। আর সমাজের যতসব বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। ওদের কাছে গরিব বড়োলোক বলে কিছু নেই। বিপদে পড়ে যে তাদের কাছে আসে, তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করাই তাদের কাজ।

তবে কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করা ওদের স্বভাববিরুদ্ধ। আর অর্ক সেনই ওদেরকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। অথচ নিয়মশৃঙ্খলা বড়ো কঠিন, যে নিয়ম ভাঙবে, তাকে চলে যেতে হবে তাদের ছেড়ে। বর্তমান রাজনীতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে আর যাই হোক, সাধারণ মানুষের কোনোরকম উপকার হবে না। একটা শ্রেণির মানুষ দিন দিন বঞ্চিত হতেই থাকবে। তাদের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াবার মতন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্ক সেনরা তাদের মতন

মানুষের জন্য বেশি বেশি কাজ করবে। দিন যত গড়াতে থাকল, অর্কর কাজের খ্যাতিও বাড়তে লাগল। সবাই এখন অর্ক সেনকে এক ডাকে চেনে। রঞ্জনবাবু ছেলের কাজকর্মে খুব সন্তুষ্ট। তিনি মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়েন গ্রামে গ্রামে। সেখানকার মানুষজনদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে যান ছেলে কি করছে। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই অর্কর কাজে খুশি। অর্ক তার ছেলেদের দিয়ে গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে পৌঁছোনো থেকে শুরু করে একেবারে বিয়ে, পইতে, অন্নপ্রাশন, রোগীদের দেখভাল করা, আবার শবযাত্রী হয়ে শ্মশানে যাওয়া সব কাজই করিয়ে থাকে। ইদানীংকালে ওরা একটা গাড়িও কিনেছে। যাতে করে কেবলমাত্র রোগীরাই যেতে পারবে। তবে নামমাত্র ভাড়া লাগবে। যদি কেউ সেই ভাড়ার টাকা জোগাড় করতে না পারে, তা হলে অর্ক সেন, তার তহবিল থেকে দিয়ে দেবে।

এইভাবে কাজের পরিধি যখন বিস্তার লাভ করছে, তখন অর্ক সেন তার ছেলেদের ডেকে বলল, আমাদের এই কাজ করতে গেলে একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে। তা ছাড়া সংস্থাটার একটা নামেরও প্রয়োজন আছে। আজ আমি অর্ক সেন আছি, চলে যাচ্ছে। লোকে বলছে অর্ক সেনের মতন ছেলে হয় না। কিন্তু এটা তো ঠিক হচ্ছে না। আমরা যারা এখান থেকে কাজ করছি, তারা সবাই যেন আনন্দটাকে ভাগ করে নিতে পারি, আবার দুঃখ এলে সেই দুঃখটাকেও ভাগ করে নিতে পারি। দেখিস না, স্বাধীনতার জন্য যারা হাসতে হাসতে প্রাণ দান করে গেছেন, তাদের সামনে ছিল দেশমায়ের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করা। দেশপ্রেম ছিল তাদের প্রেরণার উৎস। ঠিক তেমনই সামনে থাকবে আমাদের এই সংস্থার নাম। অর্ক বলল, আমি একটা নাম ঠিক করেছি। যদি সকলে একমত হতে পারো তা হলে বলি, আমাদের এই সংস্থার নাম হোক, 'নীল নিঃশব্দ'।

সবাই স্বতস্ফূর্তভাবেই সমর্থন করে, সংস্থাটির নামকরণ হয়ে গেল নীল নিঃশব্দ। নীল নিঃশব্দের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলছিল। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক দাদারা নীল নিঃশব্দের প্রতি বেশ কিছুদিন ধরেই কুদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। গ্রামে গ্রামে নীল নিঃশব্দের ছেলেরোই কাজ করবে, তাহলে তাদের ভগবানের আসনে বসে থাকাটা নিষ্কণ্টক হবে, এটা ভাবতে যেন বড়ো বেশি কষ্ট হচ্ছে তাদের।

গ্রামে গ্রামে যেসব রাজনৈতিক দাদারা সব এক-একজন ভগবান সেজে বসেছিলেন, তাদের আসন একটু হলেও টলিয়ে দিয়েছে, নীল নিঃশব্দ। তাই তারা নীল নিঃশব্দের নেতা বা সেক্রেটারি অর্ক সেনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। নানান অজুহাতে তাকে হেনস্তা করাই যেন প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে। সব থেকে বড়ো কথা হল, পড়াশোনা শেষ করে সব ছেলে-মেয়েরাই নীল নিঃশব্দে ভিড়

করছে। এটা কি কোনো ভগবানের ভালো লাগে। ওইসব ছেলেমেয়েদের দিয়েই তো সমাজের যতসব খারাপ কাজ করানো হত, পার্টির ঝান্ডা নিয়ে ঘুরলে তোদের চাকরি হয়ে যাবে, এই সব মিথ্যে প্রতিশ্রুতির কথাতে, নীল নিঃশব্দ বিশ্বাস না করতে শিখিয়েছে। আবার নীল নিঃশব্দে নাম লেখালেই যে চাকরি হবে, তাও কিন্তু নীল নিঃশব্দ বলে না। তবে হ্যাঁ, তারা শিক্ষিত বেকারদের সঠিক পথটা বেছে নিতে সাহায্য করবে। তারা বলে, পার্টির ভগবান দাদাদের পিছনে ঘুরে চাকরি হবে না, সেই সময়টা ওখানে নষ্ট না করে নিজে বাড়িতে বসে পড়াশোনা করলে চাকরির অভাব হবে না। আজকে গ্রামে গ্রামে এইসব বার্তা পৌঁছে গেছে, তার সঙ্গে পার্টির ভগবান দাদাদের কাছেও। যারা ছিল এতদিন শেষ কথা, তাদের কাছে আজ আর তেমন মানুষজন আসে না। ফলে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে অর্কর উপর।

আজকের ভগবান দাদারা সব, এতসবের পরে চুপ করে কেউ বসে থাকতে পারে? তারা অর্ক সেনের নামে উচ্চতর মহলে নানারকম নালিশ জানাতে থাকে। নানান মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে অর্ক সেনের নাম। তারা কিভাবে অর্ক সেনকে জব্দ করবে তার ফন্দি আঁটতে থাকে। একটা সাধারণ ছেলে তাদের উপর টেক্কা দেবে। এ কখনো হতে পারে। তা ছাড়া কোনোরকম রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় না থেকে, শুধুমাত্র নীল নিঃশব্দের হয়ে কাজ করে সমাজের মানুষের কাছে এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করা, মোটেই সাধারণ কাজ নয়। তাদের সামনে রয়েছে স্বপ্ন আর আদর্শ। যাকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে নীল নিঃশব্দের ছেলেগুলো। তাই অর্ক সেন হয়ে উঠেছে আজ জনগণের মাথার মণি।

সেজন্যই মধুপুরের ভগবান দাদাদের একজন, কিছু সমাজবিরোধীদের নিয়ে আলোচনা করে ঠিক করে নেয়, না, তারা আর নীল নিঃশব্দকে একটি পা-ও এগোতে দেবে না। যেভাবেই হোক অর্ক সেনকে খতম করে দেবে। ভগবান দাদাদের পরিকল্পনামাফিক একদিন রঞ্জনবাবুকে বাড়িতে এসে শাসিয়ে যায়, —আপনার ছেলেকে সাবধান করে দেবেন, কোনোরকম ভালো কাজ আর সে না করে। যদি-বা করে তা হলে তার ফল হবে মারাত্মক।

রঞ্জনবাবু অর্ক বাড়ি ফিরলে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। অর্ক সমস্ত কথা বাবার মুখ থেকে শোনার পর মনে মনে ঠিক করল যে, নীল নিঃশব্দ যেমন সমাজসেবা করে যাচ্ছে, এখন থেকে তাদের আরো বেশি বেশি করে করতে হবে। কারণ তাদের পাশে যদি বেশি মানুষ থাকে তা হলে ভগবান দাদারা বেশি দূর এগোতে পারবে না।

এদিকে রঞ্জনবাবু ছেলের কাছ থেকে কোনোরকম উত্তর না পেয়ে একটু হতাশ হলেন। কিন্তু ভেবে দেখলেন, ছেলে তো তার খারাপ কাজ কিছু করছে না। মানুষের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোটা, অনেকে ভালো চোখে না-ও দেখতে পারে। তাই বলে নীল নিঃশব্দ আদর্শচ্যুত হবে? তা কখনোই হতে দিতে পারেন না। আর তা যদি হয় তা হলে তাঁর এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা, সাধনা, সব মিথ্যে হয়ে যাবে। তা তিনি হতে দিতে পারেন না। তাই তিনি চুপ করে থাকলেন।

অর্ক সেন ব্যাপারটা নিয়ে নীল নিঃশব্দের ছেলেদের মধ্যে বেশি কথা না বলে শুধু কাজ করে যেতে থাকল। এদিকে ভগবান দাদারা নীল নিঃশব্দের উপর কড়া নজর রেখে যাচ্ছিলেন। অর্ক সেনের কাজকর্মের প্রতি নজরদারিটা ইদানীং একটু বেশি বেশিই করছিলেন। তবে সব থেকে যার গায়ে জ্বালা ধরছিল বেশি তিনিও এই মধুপুর গ্রামেরই মানুষ। ওনার নাম হল শংকর বাগ। তবে শংকরদা বলেই চেনে সকলে। ইদানীং ভগবান দাদা হয়ে আসল নামটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে ভদ্রলোক ভালোমতোই মদ্যপান করে থাকেন, সঙ্গে মেয়ে হলেও আপত্তি নেই। এ-হেন শংকরদা বর্তমানে মধুপুর গ্রামের একজন ভগবান, কারণ বাঁচামরা তো ওদের হাতে। শুধু কি তাই, শবদাহ করতে গেলে, পঞ্চাশ লিটার মদ, তার সঙ্গে চাট হিসেবে মুরগির মাংস শংকরদার অফিসে জমা দিতে হবে। তবে না শবদাহ হবে। তবে সবই দিতে হবে নগদে। নাহলে শবদাহ করার লোক পাওয়া যাবে না। এই হেন শংকরদার কথা অমান্য করা কি এত সহজ ব্যাপার। শংকরদা মধুপুর গ্রামে একটা নীল নিঃশব্দের বিরুদ্ধে সভা ডাকার ব্যবস্থা করলেন। যথাসময়ে সভাও ডাকা হল। পাশাপাশি গ্রামের মানুষদেরও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু শংকরদার সভায় তেমন উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল না। শংকরদা খুবই আতঙ্কিত হলেন। এতদিনের অর্জিত ক্ষমতা কি তা হলে যেতে বসেছে? তিনি বিষয়টি নিয়ে খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কি করে নীল নিঃশব্দের রথের চাকা থামিয়ে দেওয়া যায় তার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। শংকরদা গোপনে গোপনে ফন্দি আঁটতে লাগলেন। সরাসরি অর্ক সেনের সঙ্গে লড়াইয়ে গেলে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। তাই একটা এমন জায়গায় ফাঁসাতে হবে, যাতে সবাই না বিশ্বাস করলেও কিছু মানুষ তো বিশ্বাস করবে। শংকরদার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ভালোই রয়েছে। মানুষকে ফাঁদে ফেলায় যারা অভ্যস্ত, তাদের কাছে এ-আর এমনকী কঠিন কাজ।

কিন্তু যারা অর্ককে ভালোবাসে যারা নীল নিঃশব্দের ছায়ায় এসে উপকার পেয়েছে, যারা বর্তমান সময়ে ভগবান দাদারা ছাড়াও বাঁচা যায়, নীল নিঃশব্দ তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে। তারাও সবসময় চোখ-কান খোলা রেখে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন মধুপুর গ্রামের মোহন সমাদ্দার নামে একটি বছর পঁচিশের যুবক মারা যায়। বাড়িতে ছেলেটির মা, স্ত্রী ও একটি বছর দেড়েকের মেয়ে ছিল। মোহনবাবু সবে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। পাশের গ্রামের হাইস্কুলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তার অকালমৃত্যু হল।

এদিকে নীল নিঃশব্দের ছেলেরা হাজির হয়েছিল শবদাহ করার জন্য, আবার অর্ক সেন, বাড়ির লোকেদের সান্ত্বনা দেবার কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ শংকরদা তার দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। মোহনবাবুর বাড়িতে ঢুকেই মোহনবাবুর স্ত্রী তিয়াসাদেবীর খোঁজ করতে থাকলেন। শংকরদা শেষমেষ খোঁজ পেলেন তিয়াসা দেবীর। বাড়িতে অনেক লোকজনের মাঝখান থেকে খুঁজে বের করতে একটু বেগ পেতে হল তাকে। তাতেই শংকরদার রাগ হয়ে গেল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তিয়াসা দেবীকে জিজ্ঞেস কবলেন, আমরা কি আপনার স্বামীর শবদাহ করতে যেতে পারব না?

তিয়াসাদেবী তখন শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তবুও তিনি সংযতভাবেই বললেন, কেন যেতে পারবেন না। আপনারা নিশ্চয় যাবেন। তবে হ্যাঁ দেখবেন আরও যারা যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে কোনোরকম গণ্ডগোল যেন না হয়। আপনারা তাদেরকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন এ তো খুব ভালো কথা। যান যান আপনারাও নীল নিঃশব্দের ছেলেদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে দিন।

কথাগুলে বলতে বলতে তিয়াসাদেবী আবার বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। এদিকে শংকরদা কথাগুলো শুনে একটু রাগান্বিত হলেন। মনে মনে ঠিক করলেন তিনি শবদাহ করতে যাবেন না। যেই ভাবা, সেই কাজ। তিনি তার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন তৎক্ষণাৎ।

অর্ক সেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দিকে নজর রেখেছিল। কিন্তু সে মুখে একটি কথাও উচ্চারণ করল না। যথাসময়ে শবদাহ হয়ে গেল। তিয়াসাদেবীর আত্মীয়রা যারা উপস্থিত ছিল তারাই শবযাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সময়মতো শবযাত্রী ও বাড়িতে উপস্থিত মানুষজন সকলে মিলে আহারের পাট চুকিয়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল।

দু-চার দিন গত হবার পর একদিন সন্ধেবেলা অর্ক সেনকে ডেকে পাঠালেন লোক দিয়ে তিয়াসাদেবী। অর্ক যথাসময়ে হাজির হয়েছিল তিয়াসাদেবীর বাড়িতে। অর্ক যাবার পর মোহনবাবুর এক আত্মীয় অর্ককে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর বাড়ির ভেতরে খবর পাঠালেন অর্কবাবু এসে গেছেন। তিয়াসাদেবী চা-

জলখাবারের বন্দোবস্ত করার কথা বলে দিয়ে বসার ঘরে এসে হাজির হলেন। অর্কবাবু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। তিয়াসাদেবীও প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপর পরস্পর কুশল বিনিময় করে কাজের কথা শুরু করলেন।

অর্কবাবু আপনাকে ডেকে পাঠানোর কারণটা বলি তা হলে।

নিশ্চয়। আপনি হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন?

তা হলে শুনুন। বুঝতেই পারছেন, ক-দিন বাদেই আপনার দাদার শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে হবে, আমি মনে মনে ঠিক করেছি, আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন, যদি আপনার কোনো অসুবিধে না থাকে।

ঠিক আছে। তা আমায় কি কি করতে হবে সেটা তো জেনে রাখা দরকার, কি বলুন?

হ্যাঁ, সে তো বটেই। ধরুন ক্ষৌর-কর্মের দিন থেকে আপনি এবং আপনার ছেলেরা সবাই মিলে আমার সমস্ত কাজ দেখভাল করবেন।

মোটামুটি আন্দাজ কত লোক নিমন্ত্রিত হবেন, কিছু ঠিক করেছেন?

তা-বইকি। ওই ধরুন, শ-তিনেকের মতন হবে। হ্যাঁ, আর-একটা কথা, আমার তো তেমন কেউ নেই, যে বাজার-হাটটা করে দেবে। তাও কিন্তু আপনাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

ঠিক আছে। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। প্রয়োজন হলেই ডেকে পাঠাবেন। কোনরকম সংকোচ করবেন না, আপনি নিশ্চয় শুনেছেন যে আমরা যে-কোনো মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

হ্যাঁ তা শুনেছি। আপনার নীল নিঃশব্দের কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

আপনি খানিকটা বাড়িয়ে বলছেন মনে হয়। তবে আমি তোশামোদ একেবারেই পছন্দ করি না। সেটা বোধ হয় আপনার জানা ছিল না। এই কথাটা জেনে রাখুন। আর আমাদের সংস্থার নাম কিন্তু 'নীল নিঃশব্দ'।

আপনি বোধহয় ভুল করছেন অর্কবাবু। এটা শুধু আমার কথা নয়, গ্রামে এখন সবাই নীল নিঃশব্দকে চেনে। বিশেষ করে যে সময়টাতে কোনো মানুষ স্বার্থ ছাড়া একটি পা-ও ফেলার কথা ভাবছে না, সেই সময়টাতে একা নীল নিঃশব্দ বিনা স্বার্থে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এতবড়ো কাজকে আমি ছোটো করে দেখতে যাব কোন দুঃখে, বলতে পারেন?

আমি ঠিক তা বলিনি। আমি যা বলতে চাই, মানুষ যদি মানুষের জন্য কাজ না

করে, তাহলে সমাজটা কোথায় যাবে বলতে পারেন। এই ধরুন শংকরদাদের কথা। এরা নাকি সমাজের মাথা। অথচ দেখুন, কেমন দিব্যি আরামে আছেন। টাকা ছাড়া কথা নেই। যাদের টাকা আছে তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু যাদের টাকা নেই, তাদের বেলা, না, ওদের কাছে মুড়ি-মুড়কির একই দাম। ফ্যাল কড়ি, মাখো তেল।

আপনার দাদা বলতেন, খবরদার ওদের কাছে যাবে না। ওরা তোমাকে শেষ করে দেবে। যদি প্রয়োজন মনে করো তাহলে তুমি নীল নিঃশব্দের কাছে যাবে। যারা তোমাকে ঠকাবে না। যারা তোমায় সাহায্য করবে নিঃস্বার্থভাবে। ওদের মধ্যে অর্ক ছেলেটা খুব ভালো। ওর কোনোরকম অহংকার নেই। ওর কাছে জাতপাত নেই। আর নেই গরিব বড়োলোকের ভেদজ্ঞান। ওরা সবার জন্যে। বিশেষ কোনো শ্রেণির জন্যে নয়।

আজ অনেক কথা হল। আর নয়। এবার তা হলে ওঠা যাক।

পুনরায় অর্ক হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল। প্রতিনমস্কার করলেন তিয়াসাদেবী। অর্কর নীল নিঃশব্দে ফিরে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। কিন্তু সবাই ছেলেরা তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। সে পৌঁছোতেই সকলে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করল। ইদানীং একটু-আধটু চিন্তা করছে সকলে। কারণ শংকরদারা লোক হিসেবে মোটেই ভালো নয়। যে-কোনো সময় যে-কোনো ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে।

অর্ক ফিরে এসে সমস্ত কথা খোলাখুলি ভাবে বলল সকলের কাছে। তিয়াসাদেবী আমাদের ব্যাপারে খুব বেশি আশাবাদী। তাই তিনি সব কাজ আমাদের দিয়েই করাতে চান। আমি কিন্তু কথা দিয়ে এসেছি তাঁকে। তোমরা সকলে মিলে কি বলবে, না জেনেই। কোনো অন্যায় করে ফেলিনি তো? সকলে এক সাথে উত্তর দেয়, না-অর্কদা। তুমি কোনো অন্যায় করোনি?

এবার অর্ক বলে, তা হলে আজকের মতন এবার বাড়ি ফেরা যাক। সবাই একের পর এক বাড়ি ফিরে গেল। অর্ক সবার শেষেই বাড়ি যায়। সবাই যখন চলে গেছে তখন অর্ক শংকরদাকে নিয়ে ভাবতে বসল। হঠাৎ করে শংকরদারা কেন তার পিছনে লেগেছে। সে তো তাদের কোনো ক্ষতি করেনি। তা ছাড়া নীল নিঃশব্দ তো কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেনি। তা হলে কেন তারা তাদের ক্ষতি করবার কথা ভাবছে। নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু এমন রহস্য লুকিয়ে আছে। যে রহস্যের কথা সে জানে না। কিন্তু অর্ক সেনকে সেই গোপন রহস্য ভেদ করতেই

হবে। এসব কথা ভাবতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে গেছে। এবার বাড়ি না ফিরলেই নয়। রঞ্জনবাবু ছেলের আসতে দেরি দেখে খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। ঠিক এমন সময় অর্ক বাড়িতে পৌঁছোল। রঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি এসে গেট খুলে দিলেন। অর্ক সাইকেলটা বারান্দায় রেখে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। জামাকাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে খেতে গিয়ে দেখে রঞ্জনবাবু খুব চিন্তায় রয়েছেন। মা মৈত্রীদেবীও খাবার দিতে দিতে বললেন, অর্ক এত রাত করে বাড়ি ফিরলে, তোর বাবার যে স্ট্রোক হয়ে যাবে। সেদিকে খেয়াল রাখিস। একটু তাড়াতাড়ি করে ফিরতে তো পারিস।

অর্ক কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। মৈত্রীদেবী স্বামীকে বললেন, এসব এই তোমার আশকারা পেয়েই হচ্ছে। ছেলে কোথায় বুড়ো বাবা-মাকে সুখী করার কথা ভাববে, তা-না, দেশ উদ্ধারের কথা ভাবছে। বুড়োবুড়ি মরে মরুক, তাদের নিয়ে ভাববার সময় কোথায়। রঞ্জনবাবুও একসময় নিজের ঘরে চলে গেলেন। মৈত্রীদেবী সব গুছিয়ে রেখে শুতে গেলেন।

দেখতে দেখতে তিয়াসার স্বামীর শ্রাদ্ধের দিন এসে উপস্থিত হল। অর্ক তার ছেলেদের নিয়ে ক্ষৌরকর্মের দিন থেকে হাজির ছিল, একেবারে শ্রাদ্ধের দিন নেমতন্ন করা থেকে সর্ব কাজেই অর্কর ছেলেরা। অর্ক প্রত্যেকের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে একটুও ভুল করেনি।

যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে শ্রাদ্ধের দিন কেটে গেল। সবাই বলল, নীল নিঃশব্দের ছেলেরা যা করেছে, এত সুন্দর ও সুচারু ভাবে কাজটা শেষ করতে পারবে, এ-কথা কেউ ভাবতেই পারেনি। তিয়াসা নিজে অর্ক ও তার ছেলেদের অভিনন্দিত করতে ভুল করেনি।

কিন্তু সবশেষে তিয়াসাদেবীর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আসার সময় তিয়াসাদেবী অর্ককে বলেছিলেন, সত্যিই অর্কবাবু, আমি অভিভূত। আপনার কাজের কথা নানাজনের মুখ থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু আজ নিজের চোখে দেখলাম। সত্যিই আপনি পারেন। আপনার কাজের জন্য আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনি মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসবেন। আপনি ভাববেন না, কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি বলি, আপনার কাজ আজ থেকে শুরু হল। কারণ যদি কোনোদিন কোনো অসুবিধেয় পড়ি তাহলে আপনাকে ডেকে পাঠাব, আপনি আসতে কোনোরকম সংকোচ করবেন না কিন্তু।

অর্ক বলল, আজ আর দেরি নয়, ছেলেরা অনেক আগেই চলে গেছে। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। নমস্কার। নমস্কার জানিয়েই অর্ক পথে নামল। নীল নিঃশব্দে ফিরে দেখে সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে এসে পৌঁছোতেই একে একে বিদায় নিতে শুরু করল। সব শেষে একজন অর্কর কাছে এসে বলল, অর্ক-দা তুমি বেশি রাত করে বাড়ি ফিরবে না। তা ছাড়া কাকাবাবু-কাকিমা তোমার জন্য খুব চিন্তা করেন। অর্ক ছেলেটিকে বলল, হ্যাঁরে শুভেন্দু, তুই বুঝলি কি করে এতসব। তাছাড়া আমার মা-বাবা চিন্তা করেন বলে বলছিস, না অন্য কোনো কারণ রয়েছে এর মধ্যে?

শুভেন্দু মুখার্জি প্রথমে একটু থতোমতো খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না-না, অন্য কারণ কি আর থাকতে যাবে। তবে তুমি কিন্তু সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে। আর যাদি কোনোদিন কাজের জন্য বেশি রাত হয়েও যায় তাহলে কিন্তু আমরা তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। তুমি কিন্তু সেদিন না বলতে পারবে না। আজকে তুমি বাড়ি চলে যাও।

তা হ্যাঁরে, শুভেন্দু, তোরা আমাকে খুব ভালোবাসিস তাই না?

অতসব জানিনে, তোমার কিছু একটা হয়ে গেলে নীল নিঃশব্দটা শেষ হয়ে যাবে অর্কদা।

বোকা কোথাকার! কোনো একজনের জন্যে এতবড়ো একটা সংস্থা শেষ হয়ে যাবে। তা হলে কি তোরা বলতে চাস, কেবলমাত্র আমার জন্যেই এই নীল নিঃশব্দকে তৈরি করেছি। তা ছাড়া তোরা তো আছিস আমি না থাকলে তোরা কেউ দায়িত্ব নিয়ে চালাবি।

তা হয় না অর্কদা। তোমার মতন মানুষ এ-যুগে দুর্লভ। এখন সবাই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। কে দেখবে তোমার স্বপ্নের এই নীল নিঃশব্দকে?

কেন? আমি যদি বলি তুই দেখবি। কেন? পারবি না আমার স্বপ্নের নীল নিঃশব্দকে বাঁচিয়ে রাখতে। আমাদের আদর্শকে রক্ষা করতে?

না অর্কদা, তা হয় না, কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি। জানো অর্কদা, আমিও হয়তো পারতাম, কিন্তু ...

কিন্তুটা কি শুভেন্দু?

বাড়িতে বুড়ো বাবা-মা, ছোটো একটা বোন, তার বিয়ে দিতে হবে। তাতে আবার বেকার, চাকরি নেই। সামান্য কটা যজমান, তাদের ঘরে পুজো-আর্চা করে

ক-দিন আর চলে গো অর্কদা। আমি যদি একটা চাকরি-বাকরি পেতাম তাহলে হয়তো পারতাম।

তা হলে চাকরির জন্যে চেষ্টা তো করতে হবে। চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন ভাই। ঠিক আছে তোর মতন যারা নীল নিঃশব্দে আছিস, অথচ চাকরি না হলে চলবে না, তাদের একটা নামের তালিকা তৈরি করে আমাকে দিবি। তারপর তোদের নিয়ে ভাব যাবে। দুঃখ করিস না। একটা কথা মনে রাখার চেষ্টা করিস, কাউকে দুঃখ দিয়ে নিজেকে সুখী করা যায় না। আবার দুঃখ থেকে পালিয়ে বেড়ানো কাপুরুষতা, দুঃখকে জয় করাই শ্রেয়।

ঠিক আছে অর্কদা, আজ আর কথা না বাড়িয়ে চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

আজ তোর কি হয়েছে বল্ তো শুভেন্দু? তোকে দেখে মনে হচ্ছে আমায় নিয়ে তুইও খুব চিন্তিত।

ঠিক আছে, তুমি ওঠো তো আগে, রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে।

তারপর একরকম জোর করেই অর্ককে টেনে চেয়ার থেকে তুলল শুভেন্দু। নিজেই ঘরের তালাচাবি নিয়ে, অর্ককে বাইরে বের করে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে অর্কর হাতে চাবিটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে বলল, এবার সাইকেলটা নাও, দুজনে হাঁটতে হাঁটতে যাব। কথা বলতে বলতে গেলে ভালোই লাগবে। কি বলো অর্ক-দা?

অর্ক যতই দেখছে শুভেন্দুকে ততই অবাক হচ্ছে। মনে মনে সে ভাবছে কি ব্যাপার শুভেন্দু আজ এরকম ব্যবহার করছে কেন? একসময় শুভেন্দুই সমস্ত ধাঁধা কাটিয়ে বলতে শুরু করল।

জানো অর্কদা, শংকরদা নাকি তোমার উপর খুব চটে গেছে। সে লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, তুড়ি মেরে নাকি আমাদের নীল নিঃশব্দকে উড়িয়ে দেবে। তাই ভয় হচ্ছে, যদি লোকটা তার দলবল নিয়ে কিছু একটা করে দেয়।

ও, তাই বল্! এইজন্যে তুই আমাকে বাড়ি পৌঁছোতে যাচ্ছিস? আচ্ছা শুভেন্দু, তুই কেন এত সহজ সরল বলতো? সবাই এতক্ষণ যে যার বাড়ি গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, আর তুই কিনা অর্ক সেনের বিপদের কথা ভেবে, তাকে বাড়ি পৌঁছোতে যাচ্ছিস। তা হলে লোকে যে আমাকে বোকা ছেলে বলে গালাগাল দেয়, সে-কথা তো সত্যি নয়। শুভেন্দু তুই আমার থেকেও বোকা।

অর্কদা, তুমিও আমায় বোকা বলবে?

বলব না, কেন বলব না বল্ শুভেন্দু? আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তুই তো একা বাড়ি যাবি। ধর, তখন তোর কোনো বিপদ হল, তা হলে কি হবে? একবারও ভেবে দেখেছিস।

না, তা হবে কেন? শংকরদার রাগ তো তোমার উপর, আমার উপর তো তার কোন রাগ নেই।

আচ্ছা তুই কি করে জানতে পারলি যে তোর উপর তার রাগ নেই। তা ছাড়া তুই কেন আমার জন্যে তোর অমূল্য জীবনটা বলি দিতে চাস ভাই?

ওকথা বোলো না অর্কদা, যদি তোমার জন্যে এই তুচ্ছ জীবনটা বলি দিতে পারি, তাহলে জানব গতজন্মে বহু পুণ্য করেছিলাম। আমার জীবনের বিনিময়ে তোমার জীবন বাঁচাতে পারলে, নীল নিঃশব্দ বেঁচে যাবে যে। আর নীল নিঃশব্দ বাঁচা মানে, কত অসহায় বিপন্ন মানুষ বেঁচে থাকার আশ্বাস পাবে। আমাদের মতন গরিবদের ঘরের মেয়েদের লজ্জা বিক্রি করতে হবে না। আজ আর নীল নিঃশব্দ তোমার একার স্বপ্নে নেই। আজ সে লাখো মানুষের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। একদিন কোটি মানুষ নীল নিঃশব্দকে সেলাম ঠুকবে দেখে নিয়ো।

এত কথা তোর মনের গভীরে জমা হয়েছিল, তা-তো জানতাম না শুভেন্দু। অবশ্য জানবার কথাও নয়। কারণ কেউ যদি নিজের মন থেকে কাউকে ভালোবাসতে না পারে তা হলে সে ভালোবাসা অন্যকে আপ্লুত করতে পারে না। আজ তুই তোর আন্তরিকতার কথা উজার করে বলে দিলি আমার কাছে। তোর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মাথা নত করতে ইচ্ছে করছে।

না অর্কদা না, তুমি আমার কথায় কিছু মনে কোরো না। আমার মনে যা এসেছে তাই বলে ফেলেছি।

এতবছর নীল নিঃশব্দ চলছে, কিন্তু এমনি করে কেউ-তো এগিয়ে আসেনি। তা ছাড়া কেউ তো আমার কথা এমনি করে ভাবেনি। এইজন্যেই তোকে বলছিলাম, তুই একটি আস্ত বোকা। ঠিক আছে আমরা বাড়ির কাছে এসে গেছি। তুই এবার আয়। সাবধানে যাস। কাল আবার দেখা হবে।



এইভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। দিন যত গড়িয়েছে ততই 'নীল নিঃশব্দ'

শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছে। তার মাঝখানে অনেক ঘটনাও ঘটে গেছে। অর্ক সেনের মনে যে বিষয়টা বেশি বেশি করে দাগ কেটেছিল সেই বিষয়ের উপর খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছে, শংকরদাদের নজর কেন নীল নিঃশব্দের উপর পড়েছে। শংকরদার দলের বেশিরভাগ মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি রয়েছে, তাই তিয়াসাদেবীর স্বামী মারা যাবার পর নীল নিঃশব্দের ছেলেরা শবদাহ থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধ-শান্তি পর্যন্ত যেভাবে লেগেছিল তাতে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি, এটাই হচ্ছে শংকরদাদের রাগ। প্রথমত, তিয়াসাদেবী ছিলেন সুন্দরী, অল্পবয়স্কা, শংকরদার বহুদিন থেকেই নজর ছিল তাঁর উপর। কিন্তু কাছাকাছি হবার সুযোগ পায়নি। মোহনবাবু মারা যাবার পর যদিও একটা সুযোগ এসেছিল, সেখানেও অর্ক সেন বাড়াভাতে ছাই দিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকেই সুযোগ খুঁজছিল শংকরদা।

তিয়াসাদেবীর যে-কোনো সমস্যাতেই অর্ক সেনের ওকালতি মেনে নিতে পারছিলেন না শংকরদা। অর্ক সেন তিয়াসাদেবীর পরিবারের যে-কোনো সমস্যাতে হাত দেবার আগে নীল নিঃশব্দের সদস্যদের বলেই হাত দিতেন। কিন্তু শংকরদাদের ঠেকিয়ে রাখা একসময় দুর্বিসহ হয়ে উঠল। তারা অর্ক সেনকে নিয়ে, নানান অপপ্রচার চালানো শুরু করে দিল। এমন একদিন সামনে এসে হাজির হল যে, অর্ক সেনকে শংকরদাদের মুখোমুখি হতে হল।

এদিকে তিয়াসাদেবী নানান অজুহাতে অর্ক সেনকে বারবার বাড়িতে ডেকে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। অর্ক সেন সেই ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি। যেতে হয়েছে বারবার। কিন্তু তাতে শংকরদাদের লাভ হয়েছে বেশি।

তিয়াসাদেবী যেদিন অর্ক সেনকে প্রথম দেখেছিলেন সেদিন থেকেই তিনি অর্ক সেনকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ভালোবাসা তো শুধু একপক্ষের হলে হয় না, তার জন্যে অপর জনেরও সাড়া পাওয়া চাই। অর্ক সেন তিয়াসাদেবীকে ভালো যে বাসেননি একথা বলা সমীচীন হবে না। তিনি যদি তাঁর প্রতি দুর্বল না হতেন তাহলে কেন তিনি তাঁর ডাকে বারবার ছুটে আসতেন।

কিন্তু তিয়াসাদেবী অর্ককে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন। তিনি একসময় অর্ককে নিজে মুখে বলেও ছিলেন কথাটা। অর্ক রাজি হয়নি। সে তাঁকে অনেক বুঝিয়েছিল, যে না. যা হবার নয় তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা পাপ। আপনি ভুলে যান ওসব। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যখন অর্ক সেন তিয়াসাদেবীকে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি, তখন তিনি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ঠিক সময় বুঝে শংকরদা, তিয়াসাদেবীর বাড়িতে নানান ছুতোয় যাতায়াত শুরু

করেছিলেন। তিয়াসাদেবীর শাশুড়ি-মা বেশির ভাগ সময়টাই কাটাতেন ঠাকুরঘরে। ছেলে মারা যাবার পর কোনো ব্যাপারেই আজকাল খোঁজখবরও রাখেন না। যা করবার বউমাই করে। তিয়াসাদেবী শংকরদার উপর সব সময় সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতেন। কিন্তু যা ভবিতব্য তাকে আটকায় কে, এমনি এক বৃষ্টিবিঘ্নিত সন্ধেবেলা শংকরদা এসে হাজির হয়েছিলেন তিয়াসাদেবীর বাড়িতে। তিয়াসাদেবীর শাশুড়ি-মা তখন ঠাকুরঘরে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিয়াসাদেবীকে ডাকলেন, তিয়াসাদেবী বসার ঘরে এসে দেখলেন শংকরবাবু বসে আছেন। তিয়াসাদেবী এসে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার এমন অসময়ে আপনি হঠাৎ?

কেন আমাদের মতন লোকেদের কি আপনার বাড়িতে আসা বারণ আছে?

না, তা কেন থাকবে। তবে আপনার মতন ব্যস্ত মানুষদের কি একজনের বাড়িতে প্রতিদিন আসার সময় থাকে। তা ছাড়া আপনি সমাজের একজন মান্যিগণ্যি লোক। কারো বাড়িতে প্রত্যহ এলে আপনার সম্মানে বাধবে না?

না-না, বউমা, তা তেমন কিছু নয়। তা ছাড়া আমি কার বাড়িতে যাব-না যাব, তার জন্যেও কি জনগণকে জিজ্ঞেস করে আসতে হবে নাকি? জনগণকে যা আমরা বলব তাই তারা শুনবে। আর আমাদের কথামতো না চললে সবকিছু বন্ধ করে দেব-না! অতএব আমরা যত অন্যায়ই করি না কেন, সব অন্যায় তারা মুখ বুজে সহ্য করবে। কারণ মরবার ভয় সবার আছে না?

ভুল করলেন শংকরবাবু, আমার কিন্তু মরণের ভয় নেই। আমার স্বামী মারা যাবার পর ও ভয়টা আমায় ছেড়ে চলে গেছে। অতএব আমায় মৃত্যুভয় দেখিয়ে খুব একটা লাভ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। এবার বলুন তো কি মতলব নিয়ে এসেছেন?

অমন করে বোলো না বউমা। আমি হলাম তোমার গ্রামের পঞ্চায়েতের লোক। তাই তোমরা কেমন আছো-টাছো মাঝে মধ্যে তাই ভালোমন্দের খোঁজ-খবর নিতে আসি আর কী।

তবে শুনে রাখুন, আপনার মতলবটা যে ভালো নয় তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আপনি ভালোয় ভালোয় প্রস্থান করবেন, না লোক ডাকতে হবে?

তবে রে হারামজাদি, তোর বড় দেমাক হয়েছে দেখছি। এই কথা বলতে বলতে উঠে গিয়ে তিয়াসাদেবীকে ধরে ফেলেন। তারপর ধস্তাধস্তি চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। এমনসময় বাড়ির কাজের মেয়ে এসে দেখে, ছুটে গিয়ে শাশুড়ি-মাকে ডেকে নিয়ে আসে। শাশুড়ি-মা এসে পৌঁছোতেই ছেড়ে দিয়ে কোনোরকমে

সেদিনের মতন পালিয়ে বাঁচেন। কিন্তু শংকরবাবু হাল ছাড়ার পাত্র নয়। শিকার ফেলে রেখে পালাবার লোক তিনি নন।

শাশুড়ি-মা শোভাদেবী অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে বউমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। ওইদিনের কথা ভুলে যেতে বলেন। কিন্তু তিয়াসা বলে, কেন ভুলে থাকতে হবে মা? যদি বাঁচতে হয় তো মাথা উঁচু করে বাঁচব, না হলে বেঁচে থেকে কি লাভ?

তুমি ঠিকই বলেছ বউমা। তবে কি জানো, আমরা এতবড়ো বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে, আমরা শাশুড়ি আর বউমা, মিলে তিনটি মেয়েমানুষ থাকি, ওরা পারে না এমন কাজ তো পৃথিবীতে নেই। তাই বলি কী, আজকের কথা মনে রেখো না। মনে রাখলে তোমার দুঃখই বাড়বে।

মা হয়ে একথা বলতে পারলেন কথাটা?

না বলেও তো উপায় নেই বউমা, আমাদের যে আরও অনেক সহ্য করতে হবে। যাদের ঘরে পুরুষ মানুষ থাকে না, তাদের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

আপনি যাই বলুন মা, আমি এই অপমানের একদিন ঠিক বদলা নেব। সেদিন শংকরবাবু বুঝতে পারবেন, মেয়ে বলে ফ্যালনা নয়। তারাও রুখে দাঁড়াতে পারে।

তুমি যা ভালো বুঝবে, তাই করবে। তবে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই নাই-বা করলে।

তা হলে কী আপনি বলেন, শংকরবাবুর রক্ষিতা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে? না-মা-না তা কোনোদিনও সম্ভব নয়। এবার শংকরবাবু এলে তাকে আর জীবন্ত ফিরে যেতে হবে না, এই আমি বলে রাখলাম।

ঠিক পরের দিন সকালবেলায় কাজের মেয়ের হাতে একখানা চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন অর্ক সেনকে। তিয়াসাদেবীর চিঠিতে সব কথাই লেখা ছিল। চিঠিটি নীল নিঃশব্দের সমস্ত সদস্যকে পড়ে শোনাল শুভেন্দু মুখার্জি। সমস্ত কথা সকলে শোনার পর বলল, না এত বড়ো অন্যায় হতে দেওয়া যাবে না। একটা কিছু ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। অন্তত যাতে করে ওনারা শান্তিতে বাঁচার অধিকারটুকু পান। শুভেন্দু ও আরও ছেলেরা বলল, তুমি যাও অর্কদা। উনি যখন বিপদে পড়ে ডেকে পাঠিয়েছেন, তুমি অবশ্যই যাও। প্রয়োজন হলে আমরাও যাব। দেখি, শংকরবাবুরা কি করতে পারে।

অর্ক বলে ঠিক আছে, তোরা চোখ-কান খোলা রাখিস। আমি এখন যাচ্ছি। বলা তো যায় না, আবার আমার উপর না কিছু করে বসে। শুভেন্দু মুখার্জি বলে, কিছু করে ফেললেই হল। আমি ওই শংকরবাবুকে কামড়ে খেয়ে ফেলব না। আমরা

নীল নিঃশব্দের ছেলে। আমরা কোনোরকম অন্যায় করি না, আবার অন্যায় সহ্যও করি না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও, আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখছি তোমার উপর।

অর্ক সেন তিয়াসাদের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়াতেই ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। তারপরেই বসার ঘর। কাজের মেয়েটি দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল বোধহয়। তাই সাত-তাড়াতাড়ি দরজা খোলা সম্ভবপর হয়েছে। বসার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই অর্ক দেখল তিয়াসাদেবী বসে আছেন। অর্ককে আসতে দেখে উনি উঠে দাঁড়ালেন এবং অর্ককে বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। কাজের মেয়েটিকে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলে আবার বসার ঘরে ফিরে এলেন। অর্ক তিয়াসাদেবীকে বসতে বললেন। অর্ক তখনও তিয়াসাদেবীর মুখের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিলেন। একজন নারী তার সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় কেমন জ্বলে উঠতে পারে তা দেখবার দুর্ভাগ্য বোধহয় অর্কবাবুর সামনে উপস্থিত।

তিয়াসাদেবীই মুখ খুললেন প্রথমে। তিনি বললেন, অর্কবাবু আমার অপরাধের জন্য আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। না বুঝে আপনার মনে যদি কোনো দুঃখ দিয়ে থাকি, তাহলে নিজগুণে আমায় মার্জনা করে দেবেন এই আশাই রাখি।

কেন, হঠাৎ ডেকে পাঠানোর কারণ কি তা হলে ক্ষমা ভিক্ষা করবার জন্যে?

না অর্কবাবু, ঠিক তার জন্য নয়। তা ছাড়া চিঠিতে আপনাকে তো সবকথাই লিখে জানিয়েছি।

হ্যাঁ, আপনার দেওয়া চিঠি আমি পেয়েছি। চিঠি পেয়েই সবকিছু জানতে পারলাম। যাক ওসব কথা ছাড়ুন, কাজের কথা বলুন।

আমার ক্ষমা চাওয়াটা তা হলে আপনার কাছে কাজের কথার মধ্যে পড়ে না। তা হলে বলতেই হয়, আপনাকে কেন বারবার ডেকে পাঠিয়েও পাওয়া যায়নি। আপনি আমার সম্পর্কে কি ভাবেন বলুন তো? আমি কি খুব খারাপ মেয়ে? যে আমার কাছ থেকে আপনার দূরে সরে থাকতে হবে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে যদি আপনার যাতায়াত থাকত তাহলে আমাকে এই বিপদের মাঝখানে পড়তে হত না।

দেখুন তিয়াসাদেবী, আপনি মিথ্যে আমার উপর রাগ করে আছেন। আপনি শুধু আপনার কথাটাই ভাবলেন। আমার দিকটা একবার ভেবে দেখুন। আমি সমাজের সেবা করব বলে এই নীল নিঃশব্দকে গড়ে তুলেছি। তাছাড়া এখনো এমন কাউকে গড়ে তুলতে পারিনি, যে এই নীল নিঃশব্দের কর্মযজ্ঞকে নেতৃত্ব দিতে পারে। আপনার বাড়িতে কারণে, অকারণে যদি যাতায়াত করতাম তা হলে আমার ছেলেরাই আমাকে ভুল বুঝত। তখন ব্যাপারটা কি ভালো হত বলুন?

ও, বুঝতে পেরেছি, আপনি লোক ভয়ে আমার বাড়িতে আসা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আপনি কি জানেন শংকরদারা আপনাকেও ছাড়বে না। যতই আপনি গা বাঁচাবার চেষ্টা করুন, শেষমেষ ওদের হাত থেকে আপনার আমার, কারোর নিস্তার নেই। ওরা এ যুগের দানব। ওদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। জনগণকে যা বোঝাবে জনগণ তাই বুঝবে। অন্যায় হচ্ছে জেনেও কোনো প্রতিবাদ করবে না। মাথা নীচু করে ঘরে গিয়ে মুখ লুকোবে।

আপনি সব জেনেশুনে একথা বলতে পারছেন?

কেন বলতে পারব না অর্কবাবু, আজ আমাকে যে পারতেই হবে। না পারলে চলবে কেন। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, শেষমেষ আপনিও ওদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? বাঃ! বাঃ! অর্কবাবু, বাঃ! আপনার কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি। আমি আপনার মধ্যে যে আগুনের আভাস দেখেছিলাম আজ তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাচ্ছি না।

আবারও বলছি তিয়াসাদেবী, আপনি কোথাও একটা ভুল করছেন। অর্ক সেন কারো ভয়ে জমি ছেড়ে পালিয়ে যাবার ছেলে নয়। নীল নিঃশব্দকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমাকে যে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। যে সমস্ত অসহায় মানুষগুলো আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, তাদের কি হবে?

ওঃ তাই বলুন! তা হলে নীল নিঃশব্দের সবই ফাঁকা আওয়াজ। মুখে তারা যাই বলুন, কাজের বেলায় অন্য। অর্কবাবু, এই মাত্র বললেন না, অসহায় মানুষগুলোর কি হবে? আচ্ছা এবার বলুন তো, আমি অসহায়া নই? আপনার কথা শুনে যা মনে হল তাই বললাম। মনে কিছু করবেন না। আজ আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে কি আমার চরম অসহায়তা নয়? একটি নারী যখন তার নারীত্ব রক্ষা করবার জন্যে, একজন পুরুষের কাছে সাহায্যের হাত পাতে, পুরুষ মানুষটি কি তার নারীত্ব রক্ষা করার জন্য একটি বারের জন্যও চেষ্টা করে দেখবে না, সেই অসহায়া নারীটিকে রক্ষা করা যায় কিনা। সে কি এক বারের জন্যও বলবে না, এ অন্যায়। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

একসময় কাজের মেয়ে পরি চা জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। আপাতত গরম আলোচনার ইতি টেনে তিয়াসা জলখাবারের থালাটা বাড়িয়ে দিল অর্কবাবুর দিকে। কিন্তু অর্কবাবু বললেন, এতসব খাবার খাওয়া যায় নাকি। তার চেয়ে চা বিস্কুট হলেই ভালো হত না কি?

না ভালো হত না, সকাল থেকে অনেক হয়েছে, এবার জলখাবারটুকু খেয়ে

আমাকে উদ্ধার করুন। তারপর চা বিস্কুট তো আছেই। কথাগুলো ধমকের সুরে বললেন তিয়াসাদেবী।

অগত্যা জলখাবারটুকু বাধ্য ছেলের মতন অর্কবাবু খেয়ে নিলেন। তিয়াসাদেবী চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মাথাটা ঠান্ডা হয়েছে তো?

তা নয় হয় হল, কিন্তু কাজের কথা কি হল? এ তো শুধু অভিমানের কথা শুনলাম। অতখানি রেগে থাকলে কি কাজের কথা হয়? এখন বলুন তো কি করতে হবে আমাদের?

আমি কি বলব, আপনাকে কি করতে হবে। আপনার কাছে আমার সমস্যার কথা জানালাম। এবার ঠিক করবেন আপনারা, কি করা উচিত, আর কি করা উচিত নয়।

তাহলে সব ব্যাপারটা আমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন তো?

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। আপনার ধর্ম, আপনার কাছে। যদি মনে করেন অসহায়া নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করবেন, করতে পারেন। আবার যদি মনে হয়, আমাদের মতন অসহায়া নারীরা, শংকরদাদের মতন লম্পটদের হাতে লাঞ্ছিতা হয়ে বেঁচে থাকবে, তাও করতে পারেন। সেখানেও কোন কিছু বলার থাকবে না আমার।

এতখানি বিশ্বাস করেন আমাকে?

বিশ্বাস যদি নাই করতাম, তা হলে এত জোর দিয়ে কথাগুলো বলতে পারতাম না আপনাকে। আজ যখন বিশ্বাসের কথাই তুললেন, তা হলে শুনুন, আপনি যে লোকনিন্দার ভয়ে আমার বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিলেন, সেই লোকনিন্দা আপনাকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। কারণ আমি আপনাকে ভালোবাসি অর্কবাবু, ভালোবাসি।

চুপ করুন তিয়াসাদেবী, আপনি চুপ করুন। আমি আর শুনতে পারছি না। দোহাই আপনার, আপনি এভাবে আমার স্বপ্নের নীল নিঃশব্দকে শেষ করে দেবেন না।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এসবের জন্য আমি একাই দায়ী, তাই না? না, অর্কবাবু না। এর জন্য দায়ী আপনিও আপনার নীল নিঃশব্দ।

আমি দায়ী, আমার স্বপ্নের নীল নিঃশব্দ দায়ী। আপনি কি বলছেন আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না।

বুঝতে আপনি ঠিকই পারছেন। শুধু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। মনে করে দেখুন তো, যেদিন প্রথম আপনি আমাদের বাড়িতে এলেন, সেদিনের কথা। সেদিন সদ্যবিধবা হওয়া একটি যুবতি নারী আপনাকে বিশ্বাস করে কিভাবে তুলে দিয়েছিল স্বামীর মৃতদেহ সৎকারের ভার। একটি নারী যার বয়স মাত্র বাইশ বছর, যাকে দেখে সবাই প্রশংসা করে তার রূপের, তাকে পাবার জন্য কত পুরুষ লালায়িত হত, স্বামীর বন্ধুবান্ধবরা তো আমাদের বাড়ি এলে নড়বার নামটি পর্যন্ত মুখে আনত না। কিন্তু তিয়াসা তাদের ফাঁদে পা দেয়নি। আর আজ সেই তিয়াসা আপনার কাছে তার ভালোবাসার আঁচল পেতে দাঁড়িয়েছে, শুধু একটুখানি ভালোবাসা ভিক্ষে পাবে বলে। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, তার সাথে শ্রদ্ধাও করি। কারণ আপনি সবার থেকে আলাদা বলে।

আর দেরি করা চলে না তিয়াসাদেবী, এবার না ফিরলেই নয়। এতক্ষণ হয়তো শুভেন্দু মাথা খারাপ করে ফেলবে। সেই ঠিক আপনার মতন কি দেখেছে, কে জানে। একটুখানি চোখের আড়াল হলেই বিপদ, হাজারো প্রশ্ন করে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে দেবে।

ঠিক আছে আসুন। আর দেরি করাব না আপনার। অনেকটা মূল্যবান সময় আপনার, আমার জন্যে নষ্ট করে গেলেন। তার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে, নমস্কার।

অর্ক রাস্তায় আসতে আসতে তিয়াসাদেবীর কথাই বেশি বেশি করে ভাবছিল। শংকরদার বিষয়টা নিয়ে কি করা যাবে, তাও ভাবছিল। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় নীল নিঃশব্দে এসে হাজির হল। হাজির হয়েই দ্যাখে শুভেন্দু খালি কি বিড়বিড় করে বলছে, আর পায়চারি করছে। তাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবার কথা। মনে হচ্ছিল যেন কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অর্ক তার সামনে গিয়ে বলল, শুভেন্দু, ও শুভেন্দু, তোর কি হয়েছে বল তো? তুই ওরকম আনমনা হয়ে পায়চারি করছিস কেন?

শুভেন্দু মুখার্জি অর্ককে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটুখানি ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন অবস্থা হয়েছে তার। কি বলবে বুঝতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠেছে। তাকে হাসতে দেখে সবাই হেসে উঠেছে। অর্ক তাকে উদ্দেশ্য করে এবার বলল, তুই দেখছি আমার কথা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবি। এবার আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটা ছেড়ে দে শুভেন্দু।

কে শোনো কার কথা। যতই দিন যায় শুভেন্দুর দুশ্চিন্তা ততই বাড়তে থাকে। আজ চারদিকে অর্ক সেনের শত্রু। শংকরদা নানাভাবে তার ক্ষতি করবার ফন্দি

আঁটছে। কারণ শুধু একটাই, তাদের জনপ্রিয়তা কমছে। গ্রামের মানুষ মুখের উপর কথা বলার সাহস পাচ্ছে। যে মানুষগুলো একদিন মাথা নিচু করে থেকেছে, আজকে তারা কথা বলার সাহস পেলে শংকরদাদের রাগ তো হবেই। যতদিন তারা মানুষগুলোকে ঠকিয়ে কিছু রোজগারপাতি করছিলেন, আজ নীল নিঃশব্দের জন্য তাও বন্ধ হতে বসেছে। মাঝখান থেকে হাতটান পড়ে যাচ্ছে। তাই মরার আগে শেষবারের মতন চিৎকার করে উঠবে না।

শংকরবাবুরা আজ যে কাজ করছেন, সেইসব কাজের মধ্যে ছিল মোটা মোটা টাকা লাভ! যারা মানুষ মারা যাবার পরও তার প্রিয়জনদের কাছ থেকে ঘুষ খেতে পারে তাদের কথা বেশি বেশি না বললেও চলে।

একদিন এমন আসবে, যেদিন জনগণ ওদের কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। কড়ায়-গন্ডায় ওদের হিসেব চুকোতে হবে। ইতিহাস কখনো কাউকে ক্ষমা করে না।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর তিয়াসাদেবী আবার অর্ক সেনকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। অর্ক সেন সময় করে একদিন গেলেন তিয়াসাদেবীর বাড়িতে। আবারও তিয়াসাদেবী পরিকে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলে, বসার ঘরে এলেন। এবার আর ভনিতা না করেই সোজাসুজি বললেন, অর্কবাবু কেমন আছেন বলুন?

আমাদের আবার থাকা, ওই কোনোরকম করে কেটে যাচ্ছে আর কি! হ্যাঁ, এবার বলুন এত কী এমন ঘটল যে লোক দিয়ে ডেকে পাঠাতে হল?

আরে মশায় সে কথা বলব বলেই তো আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। চা-জলখাবারটা খেয়ে নিন আগে, তারপর আপনাকে সব বলছি।

না, তিয়াসাদেবী আজ আমার খুব তাড়া আছে, আপনি তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

তাহলে শুনুন, আপনার দাদাতো সেবাগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। অতএব আমি তাঁর স্ত্রী তিয়াসা সমাদ্দার, অঙ্ক নিয়ে এম. এসসি. পাশ করেছি। তা হলে আমি আমার স্বামীর চাকরিটা নিয়ম অনুযায়ী পাবার অধিকারিণী। কিন্তু স্কুল কমিটি এ ব্যাপারে কোনো রকম উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আমি ইতিমধ্যে ডি. আই. সাহেবের সঙ্গে দেখা করে নিয়ম মেনে সমস্ত কাগজপত্র তাঁর অফিসে জমা দিয়ে এসেছি। কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল তারও কোনও খবর নেই। পরবর্তীকালে আবারও দেখা করতে গিয়েছি, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেননি। ব্যস্ত আছি, বলে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তা হলে আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা, এ ব্যাপারে আমি এখন কি করব?

তিয়াসা কথা বলতে বলতেই পরি চা-জলখাবার নিয়ে এসে টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। তিয়াসা নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে, জলখাবারের থালাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, অর্কবাবু ডান হাতের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন, না হলে আপনারই দেরি হয়ে যাবে।

অর্ক সেন দু-একটা মুখে দিয়ে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে সঠিকভাবে খোঁজখবর না নিয়ে তিনি তো কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না। তা ছাড়া বিষয়টি নিয়ে যেহেতু এত জলঘোলা হয়েছে, তখন সহজে কিছু হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

তা হলে আমি কি এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকব?

তা কেন থাকবেন। আপনার কাজ আপনাকেই করতে হবে। আমরা শুধু সাহায্য করতে পারি।

বেশ তো আমি সেই সাহায্যের জন্যই বলছি। আমাকে আপনি সঠিক পথে নিয়ে যাবেন, এই আশাতেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনার প্রতি আমার অগাধ আস্থা রয়েছে, আগামী দিনেও থাকবে।

যাক্ আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব। নীল নিঃশব্দ এখনো কাউকে ফেরায় না, যদি সে বোঝে কাজটা সঠিক তবেই সে সেই কাজে হাত দেবে না-হলে দেবে না। আজ তাহলে আসছি। নমস্কার।

নমস্কার। আমি তা হলে ঠিক সময়ে খবরাখবর সব পাব তো?

নিশ্চয় পাবেন, বলতে বলতে অর্ক সেন চলে গেলেন। অর্ক সেদিন কোথাও অপেক্ষা না করে সোজা নীল নিঃশব্দে গিয়ে হাজির হল। সবে সূর্য অস্ত গেছে। এখনও পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে রয়েছে। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। তাই একটু পরেই এই সৌন্দর্যকে অন্ধকার এসে ঢেকে ফেলবে। তারপর গ্রামের বউ-ঝিয়েরা সাঁজের প্রদীপ নিয়ে এসে দাঁড়াবে তুলসী তলায়। গলায় আঁচল দিয়ে পরিবারের জন্যে, নিজের জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে শাঁখে ফুঁ দেবে। তখন মনে হবে যেন উৎসবের মেজাজ। তার ফাঁকে দু-চারটে প্যাঁচা ডেকে প্রহর শুরুর জানান দিয়ে যাবে। তারপর নামবে ঘন অন্ধকার। অনেক সময় যা কোনো কোনো মানুষের জীবনে নেমে আসে। তখন পথ হাতড়াতে হাতড়াতে অনেক সময় খানাখন্দে পড়ে যায়। আজ অর্ক সেনের অবস্থাও হয়েছ ঠিক তাই। সে এখন নীল নিঃশব্দের উঠোনো দাঁড়িয়ে ভাবছে, তিয়াসাদেবীর হাত থেকে মুক্তির রাস্তা কোথায়। একটু আগে যে কাজের দায়িত্ব সে নিয়ে এসেছে, সে কাজ করতে গেলে শংকরদাদের নেকনজরে

পড়তেই হবে। আবার সেই সন্দেহ, সেই অপপ্রচার। এতদিন পর্যন্ত নীল নিঃশব্দের ছেলেরা কেউ তাকে এতখানি চিন্তিত দ্যাখেনি। তাই দেখে শুভেন্দু তাকে প্রশ্ন করে, অর্কদা, কি ব্যাপার বলো তো? আজ তোমাকে খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে?

তুই ঠিকই বলেছিস শুভেন্দু, আজ আবার তিয়াসাদেবী ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি এইমাত্র তার বাড়ি হয়েই আসছি।

কেন, আবার কি হল তাঁর?

হয়েছে অনেক কিছুই, যা শুনলে তুই একেবারে খেপে যাবি।

খেপে যাই যাব, তুমি বলো তো শুনি।

এইমাত্র শুনে এলাম তিয়াসাদেবীর মুখ থেকে, তার স্বামীর চাকরিটা তিয়াসাদেবীরই হবার কথা ছিল সরকারের আইন ও নীতি অনুযায়ী। কিন্তু সেই চাকরিটা আপাতত হচ্ছে না। কারণ কে বা কারা, এ-ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে। অতএব বিষয়টি তিয়াসাদেবী নীল নিঃশব্দের হাতে ছেড়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চান।

ওঃ, এই ব্যাপার, আর তুমি এটাকে নিয়ে মন খারাপ করছ? ও নিয়ে এত বেশি ভাববার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ বিষয়টি অতীব সহজ। যদি কেউ এ-ব্যাপারে বাধা দেয় তাহলে সোজা কোর্টে যেতে হবে। কোর্ট তো আর শংকরদাদের কথায় চলে না। তাছাড়া দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর এখনও মানুষের আস্থা রয়েছে। সবথেকে বড়ো কথা হল আইন, আইনের পথেই চলবে।

শুভেন্দু, তুই যে একেবারে অবাক করলি রে ভাই। এতক্ষণ আমি মিছিমিছি দুর্ভাবনা করছিলাম। তুই ঠিকই বলেছিস প্রথমে একটু চেষ্টা করে দেখা যাক, না হলে কোর্টের রাস্তা তো খোলাই রইল, কি বল?

অর্কদা তুমি তিয়াসাদেবীকে নিয়ে ডি. আই-র কাছে যাও। কেসটা কী অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সঠিকভাবে জানবার চেষ্টা করো। তারপর না হয় কোর্টে যাওয়া যবে। আমাদের তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তোমার ওই লোকনিন্দার ভয় ছাড়ো তো দাদা। ওসব থাকলে সমাজের কোনো কাজই তুমি করতে পারবে না। তা ছাড়া সমাজে মন্দ লোক আছে বলে ভালো লোকেরা কি সব বাণপ্রস্থে চলে যাবে?

ইদানীং শুভেন্দু মুখার্জির বুদ্ধি খুলেছে দেখছি। কত কঠিন কাজটাকে ও আজ সহজ করে দিল। সত্যিই তো, আমি লোকনিন্দার ভয় করতে যাব কেন? আমরা তো নীল নিঃশব্দের। মানুষের দুঃখ দূর করাই আমাদের ব্রত। যত দুঃখই আসুক না

কেন, সব দুঃখকেই জয় করা আমাদের কাজের ধারা। মনের মধ্যে আর কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব না রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই আত্মবিশ্বাস না থাকলে, মানুষ ভালো কিছু করতে পারে না।

শংকরদা তাহলে তিয়াসাদেবীর উপর প্রতিশোধটা এই পথে নেবেন বলছেন। এও বলে রাখি অর্কদা, এবারও শংকরদার মুখে ছাই পড়বে। তিনি কোনোভাবেই তিয়াসাদেবীর চাকরি আটকে রাখতে পারবেন না। আর যদি বেশি কিছু করেন, তা হলে তাঁর দলের ভাবমূর্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ চিরকাল চুপ করে বসে থাকবে না। তারা একদিন সমস্ত অন্যায়ের কড়ায়গণ্ডায় ঠিক হিসেব বুঝে নেবে।

ঠিক আছে, শুভেন্দু, আজ আর নয়, রাত অনেক হল, এবার বাড়ি যা। এই মন্টু, এই তন্ময়, কিরে আজকে কি এখানে থাকবি নাকি। বাড়ি যেতে হবে না?

মন্টু বলে ওঠে, অর্কদা বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করে না। বাড়ি গিয়ে তো বাবা মায়ের বকুনি ছাড়া কিছু জুটবে না। তার চেয়ে নীল নিঃশব্দে থাকতে পারলে ভালো হত।

অর্ক মন্টু মণ্ডলের কথা শুনে তো অবাক, তার সাথে তন্ময়ও সায় দিচ্ছে তার কথায়। সব শোনার পর অর্ক বলে ঠিক আছে, আজ তোরা বাড়ি যা, এ-ব্যাপারে নীল নিঃশব্দ নিশ্চয় ভাববে। তবে তোদের নীল নিঃশব্দের কথা মতো চলতে হবে। মানুষ ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে। তোরা সবে মাত্র পাশ করে বেরিয়েছিস। সারাটা জীবন তোদের পড়ে রয়েছে সামনে। এখনই যদি হতাশ হয়ে যাস তাহলে কি করা যেতে পারে বল তো? তা ছাড়া ঠিক অনুশীলন আর চেষ্টা থাকলে তোরা একদিন না একদিন চাকরি পাবি। আজ আর দেরি করিস না বাড়ি যা।

শুভেন্দু রোজকার মতন ঘরের তালা বন্ধ করে অর্কর হাতে চাবিটা ধরিয়ে দিয়ে বলে, আজ চলি গো অর্কদা। বাবার শরীরটা বেশ ভালো নেই। তাই আর দেরি না করে চললাম। তুমি কিন্তু সাবধানে যেয়ো। কোথাও আর দেরি কোরো না। সোজা বাড়ি চলে যেয়ো কিন্তু। কথাগুলো বলতে বলতেই সাইকেলটা নিয়ে শুভেন্দু হুশ করে বেরিয়ে গেল।

অর্ক এখন এই শুভেন্দু ছেলেটাকে নিয়ে খুব ভাবে। গরিবের ছেলে বলেই বোধ হয় ছেলেটা এত ভালো। নিজের দুঃখকষ্টের শেষ নেই, অথচ অপরের কষ্ট ও সহ্য করতে পারে না। এই রকম ছেলেই তো দরকার নীল নিঃশব্দের। তবেই না

নীল নিঃশব্দের স্বপ্ন পূরণ হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে একসময় সে বাড়ি পৌঁছে গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে বসল চেয়ারটা টেনে নিয়ে।

এবার ভাবতে শুরু করল মন্টু মণ্ডল, তন্ময় চক্রবর্তী ও শুভেন্দু মুখার্জিদের কথা। তারপর সে এদের নিয়ে সমস্ত ভাবনা শেষ করে, একটা কাগজে লিখে রাখল। তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা উঠেই শুভেন্দুদের বাড়ি যাবে ঠিক করল সে। শুভেন্দু বলেছিল তার বাবার শরীর খুব ভালো নেই। তাই একবার যাওয়া উচিত ভেবে জামা প্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে সাইকেলে চেপে বসল। সাতসকালে অর্ককে দেখে তো শুভেন্দু হতবাক। অর্ককে একটা চেয়ার এনে দিয়ে বসতে বলল শুভেন্দু। তারপর মাকে ডেকে বলল, মাগো, ওমা, দেখে যাও, কে এসেছে!

শুভেন্দু অর্ক দুজনেই বাড়ির উঠানে দুটো চেয়ারে বসে, সকালবেলার দখিনা বাতাস, আর সূর্যের মিষ্টি আলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল। একসময় অনিতাদেবী (শুভেন্দুর মা) এসে হাজির হলেন। অর্ককে তিনি এই প্রথম দেখলেন। অর্ক চেয়ার ছেড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। অনিতাদেবী অর্ককে নিয়ে অনেক কথা শুনেছেন শুভেন্দুর কাছ থেকে। তাই আজ সেই অর্ককে সামনে পেয়ে কি ভাবে আনন্দ প্রকাশ করবেন ভেবে পেলেন না। তাই অর্ককে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। অর্ক বুঝতে পারল, যে শুভেন্দু এই মায়ের ছেলে। অর্কর চোখেও জল ভরে গেল। শুভেন্দু হতভম্বের মতো বসেছিল, অনিতাদেবী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, অর্ক, তোমাকে কাছে পেয়ে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে আনন্দে কেঁদে ফেললাম। তোমরা দুটিতে একটু বোসো, আমি তোমাদের জন্যে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করি।

অনিতাদেবী চলে গেলে পর অর্ক শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করল, মেসোমশাই কেমন আছেন?

ভালো আছেন।

তোর মুখ থেকে কথাটা শোনার পর আমি খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। আবার আজ ভালো আছেন শুনে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হলাম। আচ্ছা শুভেন্দু মেসোমশাই কোথায় গেলেন। তাঁকে তো দেখছি না।

বাবা তো হার্টের রোগী। তাই একটু হাঁটতে গেছেন। ডাক্তারবাবু বলেছেন, প্রাতর্ভ্রমণ করলে নাকি শরীরটা ভালো থাকবে। তুমি একটু বসে বাবার সঙ্গে দেখা করে তবে যাবে।

এই কথাটাও তোকে আমায় বলে দিতে হবে। সত্যিই দিনদিন তুই আমার গার্জেন হয়ে উঠছিস। ও নিয়ে তুই উপদেশ না দিলেও চলবে।

অর্কদা, তুমি আমার উপর রাগ করলে? আমি কিন্তু কিছু ভেবে বলিনি। মনে আমার যা এসেছে তাই বলে দিয়েছি।

দূর বোকা! রাগ করতে যাব কেন, তোর উপর রাগ করা সাজে না রে, তুই যদি এই অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে নীল নিঃশব্দের ভালমন্দ নিয়ে ভাবতে পারিস, তাহলে আমার মতন ছেলেদের নীল নিঃশব্দের জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। সেদিন তুই ঠিকই বলেছিলি 'অর্কদা, তুমি লোকনিন্দার ভয় পাচ্ছ'। এতসব ছোট্ট বিষয় ভাবলে নীল নিঃশব্দ লোকের মন থেকে মুছে যাবে।

অনিতাদেবী দুটো জায়গায় মুড়ি কাঁচালংকা আর বাতাসা নিয়ে এসে দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা মুড়ি খাও, আমি চা নিয়ে আসছি। অর্ক বাটিতে অনেক মুড়ি দেখে শুভেন্দুকে বলল, ভাই তুই আমাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিস। এখন একটু মুড়ি নিয়ে আপাতত বাঁচা। শুভেন্দু অর্কর বাটি থেকে মুড়ি কিছু তার বাটিতে ঢেলে নিল। অর্ক এবার মুড়িতে জল ঢেলে খেয়ে নিল। শুভেন্দু বসে বসে দেখছিল অর্কর মুড়ি খাওয়া। চোখ-মুখ দেখে সে বুঝল অর্কদা বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছে। দুজনের খাওয়া শেষ হলে অনিতাদেবী চা নিয়ে এসে দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটা মোড়া নিয়ে ছেলেদের সামনে বসে পড়লেন। বসেই অর্ককে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বাবা অর্ক, তুমি নীল নিঃশব্দকে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাও?

হঠাৎ এই প্রশ্ন করলেন কেন মাসিমা?

কেন করলাম, সে কথা বোঝবার মতন বুদ্ধি তোমার আছে। তাই করলাম।

মাসিমা, শুভেন্দু আমাকে সব কথা বলেছে। আমিও ভেবে ঠিক করে ফেলেছি কি করব বা আমার কি করা উচিত।

তুমি বাবা ঠিক করে ফেলেছ?

হ্যাঁ মাসিমা, কারণ শুভেন্দুর মতন ছেলেদের নীল নিঃশব্দের খুব দরকার। হয়তো আপনাদের মতন বাবা-মা পেয়েছে বলেই এতবড়ো মন ও পেয়েছে। জানেন মাসিমা, ওর গুণের ওর বুদ্ধির তুলনা হয় না। আমি তাই ঠিক করেছি যে শুভেন্দুই আমার স্বপ্নের নীল নিঃশব্দের প্রকৃত গার্জেন। ও যেভাবে নীল নিঃশব্দকে নিয়ে ভাবে, সত্যি বলতে কি আমিও সেভাবে ভাবতে পারি না।

ওঃ তাই নাকি! শুভেন্দু ভেতরে ভেতরে এতদূর এগিয়ে গেছে?

হ্যাঁ মাসিমা। আসলে কি জানেন গুণী মানুষরা কখনো নিজের গুণের কথা অপরের কাছে বলে না। আপনার গুণধর ছেলের বেলায়ও তাই হয়েছে।

এসব আলোচনা চলতে চলতেই শুভেন্দুর বাবা দেবেন্দ্র মুখার্জি বাড়ি ফিরলেন। অর্ক উঠে গিয়ে প্রণাম করল। তারপর চেয়ারটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বসুন মেসোমশাই। দেবেন্দ্রবাবু বললেন তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না বাবা?

আপনি আমায় কখনো দেখেননি তো তাই চিনতে পারছেন না। আমি অর্ক সেন।

এবার চিনেছি বাবা। তুমিই তা হলে সেই নীল নিঃশব্দের অর্ক সেন। তা হঠাৎ কি মনে করে গরিবের বাড়িতে আসা হয়েছে শুনি? তা ছাড়া আমাদের তো তোমাকে দেবার মতন কিছু নেই। অসহায় বুড়োবুড়ির যেটুকু ছিল তা তো তোমায় অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছি বাবা।

না মেসোমশাই, আপনি আমায় ভুল বুঝছেন। আমি কিছু চাইতে আসিনি। আমি আপনার খবর নিতে এসেছি। শুভেন্দু বলছিল আপনার নাকি শরীর খারাপ। তাই সাতসকালে খবর নিতে চলে এলাম।

তা ভালোই করেছো। আচ্ছা বাবা, শুনেছি তোমরা নাকি খুব বড়োলোক। তোমার বাবা তো শিক্ষক ছিলেন। দ্যাখো না বাবা, সকলকে বলে কয়ে আমাদের শুভেন্দুটার যদি একটা চাকরি হয়।

অর্ক মুখটা নিচু করে শুনছিল দেবেন্দ্রবাবুর কথাগুলো। ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্ট করে কথাগুলি বলেছিলেন। অর্ক শেষমেষ বলল, মেসোমশাই, আপনি আপনার ছেলের জন্য চিন্তা করবেন না। ছেলে আপনার হিরের টুকরো, ওর চাকরি ছাড়ায় কে? দেখবেন আপনাদের আশীর্বাদের জোরে ঠিক ও চাকরি পেয়ে যাবে।

এতক্ষণ শুভেন্দু ও অনিতাদেবী ওদের কথা শুনছিলেন কোনো মন্তব্য করেননি। অনিতাদেবী মাঝখান থেকে বললেন, আচ্ছা তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই, ছেলেটা এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এল, আর তুমি ঢুকতে না ঢুকতে ছেলের চাকরি নিয়ে কথা পাড়লে। তোমার কি হল বলো তো? তুমি এখন ভিতরে চলো তো। ওদের একটু কথা বলতে দাও। ও তো আর পাঁচটা ছেলের মতন নয়। অর্ক যা করছে, এ যুগে ক-টা ছেলে ওর মতন করতে পারে। ও আজ আমাদের এলাকার গর্ব।

কথাগুলো বলতে বলতে অনিতাদেবী স্বামীর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এবার শুভেন্দু বলল, অর্কদা আমাদের বাড়িতে আসায় আমি ভীষণ রকমের খুশি হয়েছি।

আচ্ছা শুভেন্দু তোর বোনটিকে তো দেখছি না। কি যেন নাম তার।

মৌ। সে তো টিউশন পড়তে গেছে। তোমার হাতে সময় থাকলে একটু বসে যাও, এখনই এসে যাবে। মৌ তো শুধুই তোমার নাম করে। সেও তোমাকে কখনো দেখেনি। কিন্তু তার বন্ধুদের কাছ থেকে আমার থেকে তোমার কথা শুনে শুনে তো তোমার ভক্ত হয়ে উঠেছে।

ও তাই নাকি? তা হলে তার সঙ্গে পরিচয় করে যেতেই হয়। তা হ্যাঁরে, মৌ পড়াশোনা ভালো করে তো?

তা আবার করবে না। ভালো ফল না করতে পারলে খাবে কি? গরিবের মেয়েতো তাই সে এটা বুঝে নিয়েছে। চাকরি-বাকরি না হলেও দুটো টিউশন করেও যেন সংসারটা চালিয়ে নিতে পারে। বাধ্য হয়েই ভালো পড়াশোনা করছে। আগামী বছর হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। মাধ্যমিকে খুব ভালো ফল করেছে। আশা করছি এবারও খুব ভালো ফল করবে।

যাক, তোর কথা শুনে ভালো লাগল যে মৌ তা হলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে। এই জন্যেই তো বলি শুভেন্দু, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। সময় মতো যদি কেউ চেষ্টা করে থাকে তা হলে কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। এই তোর কথাই ধর, তোর যা ভালো রেজাল্ট, তুই চাকরির পরীক্ষাগুলোতে যত্ন নিয়ে বসলে চাকরি তোর হবেই।

তুমি যে কি করে বলছ অর্কদা, তা তুমিই জানো। শংকরদাদের যুগে দেখছ না, তিয়াসাদেবীর স্বামীর চাকরিটা তারই পাবার কথা! সরকারি আইনে আছে। অথচ কিরকম করে শংকরদারা তিয়াসাদেবীর সামনে কতরকমের বাধার প্রাচীর গড়ে দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না।

সবই দেখতে পাচ্ছি শুভেন্দু, তবে কি জানিস, সবাইকে তুই শংকরদা ভাবছিস কেন? তাদের মাঝখানে শুভেন্দুও তো আছে।

তুমি যে কি বলো অর্কদা।

আমি ঠিকই বলেছি। সমাজে শংকরদারা আছে বলেই না নীল নিঃশব্দকে মানুষ এত পছন্দ করে।

শংকরদারা তাদের কাজ করে যাবে। আর আমরা আমাদের কাজ করে যাব। একদিন দেখবি, মানুষ ওদের কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তখন ওরা মানুষের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারবে?

তোমার কথাই যেন সত্যি হয় অর্কদা। ওদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের মানুষ ক্ষমতাচ্যুত করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

এমন সময় মৌ এসে বাড়িতে ঢুকল। শুভেন্দু ছুটে গিয়ে তাকে অর্কর সামনে হাজির করল। শুভেন্দু নিজে থেকেই বলল, অর্কদা, এই আমার পরম আদরের একটিমাত্র বোন, মৌ। আর মৌ, এই হল আমাদের প্রিয় অর্কদা, মানে অর্ক সেন।

মৌ তাড়াতাড়ি অর্ককে প্রণাম করে বলল, কেমন আছেন অর্কদা? অর্ক বলল, ভালো আছিরে। তুই কেমন আছিস? —আমিও ভালো আছি, তবে সামনে পরীক্ষা আসছে তাই একটু চাপের মধ্যে রয়েছি। মৌ কথাগুলো বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

অর্ক এবার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল। বাড়ি গিয়ে স্নান খাওয়া সেরে সোজা নীল নিঃশব্দে পৌঁছে গেল। ইতিমধ্যে শুভেন্দু এসে বসে রয়েছে। দরজা খোলা আছে। অথচ শুভেন্দু বাইরে বসে। অর্ক পৌঁছেই শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার তুই বাইরে বসে আছিস কেন?

ভেতরে তিয়াসাদেবী বসে রয়েছেন, তাই এখানে বসে আছি।

বাঃ শুভেন্দু, ভদ্রমহিলাকে একা বসিয়ে রেখে, দিব্যি তুই বাইরে বসে আছিস? সামান্য ভদ্রতাটুকুও দেখাবি না। ওনার সাথে বসে বসে সংসারের গল্পও তো করতে পারতিস। তা না করে বাইরে বসে রয়েছিস। তোরা পারিসও বটে। আয় ভেতরে আয়। বলতে বলতে অর্ক ভিতরে ঢুকতেই তিয়াসাদেবী উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। অর্কও প্রতি নমস্কার করে বসতে বলল। অর্ক জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার আজ একেবারে নিজেই চলে এলেন?

একরকম বাধ্য হয়েই চলে এলাম। কারণ সময়টা তো চলে যাচ্ছে। তাই আর দেরি না করে চলেই এলাম।

তা বেশ ভালোই করেছেন। আমাদেরও নীল নিঃশব্দের একজন সদস্য বাড়ল। কি তিয়াসাদেবী, নীল নিঃশব্দের সদস্য হতে আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?

আপত্তি কি বলছেন মশাই, আপনি আজকে না বললে আমিই আপনাকে বলতাম। আমি আপনাদের একটার পর একটা সাহায্য নেব, অথচ আমি সব সময় নীল নিঃশব্দের বাইরে থেকে যাব, তা কখনও হয়।

না, আপনার সাহসের প্রশংসা করতেই হল। একজন নারী হয়ে আপনি আজ যে সাহসের পরিচয় দিলেন তা নীল নিঃশব্দ চিরকাল মনে রাখবে।

এতে নীল নিঃশব্দেরই প্রথম সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল। আপনারা যদি সাহস করে আমার পাশে এসে না দাঁড়াতেন তা হলে শংকরদারা এতদিনে মদের চাট করে খেয়ে নিতেন।

যাক ওসব কথা বাদ দিন, এখন বলুন কি জন্যে এসেছেন?

আমার চাকরির ব্যাপারে আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটাই তো বলেছি। অতএব আর দেরি না করে এবার একটু হাত লাগান।

ঠিক আছে, বলুন আপনি ডি. আই. অফিসে কবে যেতে পারবেন?

কবে কি বলছেন অর্কবাবু, প্রয়োজন হলে আজ এক্ষুনি আমি যেতে রাজি আছি। তা ছাড়া কাজটা তো আমার, অতএব যখন বলবেন, তখনই আমি যাব।

তা হলে আজই বেরিয়ে পড়া যাক। আপনি তৈরি আছেন তো?

শুধু একটু বাড়ি যাব, কাগজপত্রের ফাইলটা তো নিতে হবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি যাব আর আসব।

দেরি করবেন না তিয়াসাদেবী, তা হলে ফিরতে আবার দেরি হয়ে যাবে।

তিয়াসাদেবী দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ি পৌঁছে কাগজপত্রের ফাইলটা ও কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলেন। ফিরে এসেই অর্কবাবুকে বললেন, কি হল চলুন। অর্ক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শুভেন্দুকে ডেকে বলল, আমার ঝোলাটা দে, আর খেয়াল রাখিস সবকিছু। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নীল নিঃশব্দের সমস্ত দায়িত্ব তোকে দিয়ে গেলাম। বিপদাপন্ন কোনো মানুষ যেন ফিরে না যায়। তোর যা করার তাই করবি। আমি কোথায় গেছি, কাউকে বলার দরকার নেই। শুভেন্দু বলল, ঠিক আছে অর্কদা, কোনো অসুবিধে হবে না দেখে নিও।

অর্ক ও তিয়াসাদেবী নীল নিঃশব্দ থেকে বেরিয়ে গেল সাইকেলে করে। কারণ বাস রাস্তাটা মাইল দুই দূরে। খানিকটা রাস্তা দুজনেই চুপচাপ ছিল। সাইকেলে ওঠার পর তিয়াসাদেবী মনে মনে অনেক কথাই ভাবছিল। বহুদিন তপস্যার পর সে আজ অর্কবাবুর সাইকেলে চড়বার সুযোগ পেয়েছে। মোহনবাবু মারা যাবার দিন থেকেই সে অর্ককে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু অর্কবাবু লোকনিন্দার ভয়ে সবসময় এড়িয়ে গেছেন। আজ কিন্তু সেই অর্কবাবু কোনোরকম কুণ্ঠা বোধ না করেই তাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

একসময় সব ভাবনা ভুলে গিয়ে তিয়াসাদেবীই প্রথম কথা বললেন। আচ্ছা অর্কবাবু, আপনি একটা মোটরবাইক কিনতে পারেন না?

না, পারি না।

কেন, টাকার অভাব?

টাকার অভাব তো রয়েইছে। তা ছাড়া আমি তো এক পয়সাও রোজগার করি না। তা হলে মোটরবাইক কিনে বাবুগিরি করি কি করে বলুন তো?

মোটরবাইক কিনলে বাবুগিরি হয় বুঝি?

তা নয়তো কি, যার রোজগার নেই, তার বাবুগিরি করা সাজে না। তাছাড়া আমার কাছে যারা আসে, তারা খুব বিপদে পড়েই আসে। মোটের উপর নীল নিঃশব্দের ছেলেরা বেকার। তারাও কেউ রোজগারপাতি করে না। তা হলে বাইকের পেট্রল আসবে কোথা থেকে?

যাদের কাজ করবেন, তারা দেবে।

তিয়াসাদেবী, সবাইকে আপনি আপনার মতন ভাবছেন কেন, বেশিরভাগ মানুষের যেখানে পেটে ভাত জোটে না, রোগে ওষুধ কেনার পয়সা জোটে না, তাদের কাছ থেকে পেট্রলের পয়সা চাইতে লৎ । করবে না। তা ছাড়া এটা নীল নিঃশব্দ। এখানে থেকে কোনোরকম বাবুগিরি চলবে না। এমনকি, আজ থেকে আপনারও বাবুগিরি করা বারণ।

ভালোই হল, অনেক টাকা বেঁচে যাবে। সেই টাকাটা আমি নীল নিঃশব্দের বিপদের দিনে সাহায্য করতে পারব।

গল্প করতে করতে একসময় পৌঁছে গেল বাস রাস্তায়। অর্ক তিয়াসাদেবীকে বাস স্টপে নামিয়ে দিয়ে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল। অর্কর খুবই পরিচিত একটি দোকানে সাইকেলটা রেখে দিয়ে তিয়াসাদেবীর কাছে ফিরে এল। একটু পরেই একটা বাস এসে দাঁড়াল। ওরা বাসটাতে উঠেই সিট পেয়ে গেল। বাসটি স্টপেজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর তিয়াসাদেবী বলল, কি অর্কবাবু এবার লোকনিন্দার ভয় করছে না আপনার? বেশ তো এড়িয়ে এড়িয়ে কাটাচ্ছিলেন, এবার শংকরদারা যদি কিছু বলে। তখন কি করবেন?

ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। সে ভাবনাটা আমার উপর ছেড়ে দিলেই খুশি হব।

ঠিক আছে মশাই, ঠিক আছে। এই নাক-কান মলছি, আর বলব না। আমার ভুল হয়ে গেছে।

এটা ভুলের কথা নয় তিয়াসাদেবী। আপনি মনে মনে যা ভাবছেন তা কিন্তু ঠিক নয়। আপনাকে কিন্তু এর জন্যে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। তখন বুঝতে পারবেন, কত বড়ো ভুল আপনি করছেন বা করতে যাচ্ছেন!

আমি অতসব বুঝিনে অর্কবাবু, আর বুঝতেও চাইনে। শুধু একটা কথা বুঝি, আমি অর্ক সেনকে ভালোবাসি। তার জন্যে যে-কোনো ধরনের চরম মূল্য দিতে রাজি আছি।

দোহাই আপনার তিয়াসাদেবী। আপনি এরকম করে বলবেন না। তা ছাড়া আমিও তো আপনার মতন রক্ত মাংস দিয়ে গড়া একটা মানুষ। আমারও চাওয়া-পাওয়া আছে, স্বপ্ন আছে, কিন্তু আমি যে মানুষের সেবা করতে চাই, আমার সাধনার পথ থেকে আমাকে টেনে নামাবার চেষ্টা করবেন না। এটা আমার বিনীত প্রার্থনা আপনার কাছে।

বেশ ঠিক আছে। আপনি একটা কথা সত্যি করে বলুন তো, আপনি কোনোদিন মনের অজানতেও আমাকে ভালোবাসেননি?

না, তিয়াসা না।

দেখলেন তো অর্কবাবু, আপনি ধরা পড়ে গেলেন কেমন।

কি করে?

ওই যে আপনার কথাটা, 'না তিয়াসা না', ওই কথাটাই আপনার মনের গোপন কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছে।

সত্যিই আপনি একটি জিনিয়াস। আপনাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে আপনার পেটে পেটে এত বিদ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

তা হলে স্বীকার করলেন তো? এবার তা হলে শুনুন, আমি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু আমি মনে প্রাণে চাই না আপনি আপনার সাধনার পথ থেকে সরে আসুন। আমি চাই না আমার সঙ্গে সময় কাটিয়ে বাজে সময় আপনি নষ্ট করুন। আমি যা চাই, তা হল আপনার ভালোবাসা। যাকে পাথেয় করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। আর আজ আপনার নীল নিঃশব্দের সদস্য হলাম কেন জানেন, আপনার কাছে থেকে, আপনাকে সাহায্য করতে পারব বলে। তাছাড়া আমি সাধারণ অর্ক সেনকে ভালোবাসিনি। আমি ভালোবেসেছি নীল নিঃশব্দর সেনাপতি অর্ক সেনকে।

তিয়াসা।

হ্যাঁ অর্ক। আমি তোমার কাছে কিছু চাই না। শুধু নীল নিঃশব্দে থেকে তোমার সাথে হাতে হাত রেখে কাজ করতে চাই। যে কাজ হবে শুধু মানুষের জন্যে। তার জন্যে লোকনিন্দাকে আমি ভয় পাইনে। একটা কথা কি জানো অর্ক। সব থেকে বড়ো ভয় তো নিজেকে নিয়ে।

তুমি তো খুব ভালো করে গুছিয়ে কথা বলতে পারো দেখছি।

এ-সবই তোমাকে ভালোবেসে। ভালোবাসা যে কি তা আমি তোমাকে দেখে বুঝলাম। কেন জানো? আমাকে পাবার জন্য কত ছেলে যে পিছনে লাইন দিয়েছিল তার কোন হিসেব নেই। কিন্তু বাবা, মা আমার দেখাশোনা করেই বিয়ে দিয়েছিলেন। মোহন আমাকে পেয়ে পাগলের মতো ভালোবেসেছিল। কিন্তু কেন জানি না, আমি তাকে ভালোবাসতে পারিনি। যখনই সে আমার কাছে আসত তখন যে আমি অন্তর থেকে সায় পেতাম না। মনে মনে ভাবতাম এ যদি আমার শরীরটাকে পাবার জন্য এত লালায়িত হয় তা হলে ভবিষ্যত জীবনে আমার কি হবে। একদিন তো এই রূপ আমার থাকবে না। তখন আমার কি অবস্থা হবে। দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতেই সব শেষ। মোহন মারা গেল। এবার বলো, আমি কি ভুল করেছি?

তোমার স্বপ্ন সার্থক হোক, শুধু এটুকু বলতে পারি।

তুমি আশীর্বাদ করো অর্ক, তোমার মতো, মনটাকে যেন শক্ত করতে পারি। তোমার কাছে কখনও না দুর্বল হয়ে পড়ি। যতই বাধা বিপত্তি আসুক, তার কাছে হার না মানি। যতদিন বাঁচব তোমার কথা মনে করেই বাঁচতে পারি।

সত্যিই তিয়াসা, আমিই তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বাইরে থেকে মানুষকে সবটা চেনা যায় না। যতক্ষণ না তার সম্পর্কে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আমি এতদিন তোমাকে শুধু ভুল বুঝতাম। তুমি আমার সেই ভুলটা ভেঙে দিলে। শুধু তাই নয় মনে মনে একটা জোরও পেলাম। আত্মবিশ্বাসটা আমার শতগুণে বেড়ে গেল। সত্যিই তোমার মতো নারীকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

আমরা এসে গেছি মনে হচ্ছে অর্ক। এবার আমাদের নামতে হবে। বাসটা খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন বলেই এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম। চল ওঠা যাক।

দুজনেই তাড়াতাড়ি সিট থেকে উঠে মেদিনীপুর শহরে পা রাখল। তিয়াসা বলল চলো, একটা রিকশা করে নিই। আমার তো আবার বেশি হাঁটার অভ্যেস নেই। বলতে বলতে তারা একটা রিকশায় চড়ে ডি. আই. অফিসে হাজির হল।

অফিসে পৌঁছেই সমস্ত কাগজপত্র ডি. আই সাহেবকে দেখিয়ে তিয়াসাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, স্যার অনেকদিন হয়ে গেল বিষয়টা নিয়ে একটু দেখুন, এতদিন তো দেরি হবার কথা নয়।

ডি. আই সাহেব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, দেখুন ম্যাডাম, আমরা আপনার সমস্ত কাগজপত্র বিকাশ ভবন-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখান থেকে কোনো সাড়া না পাওয়া গেলে আমাদের কি করার আছে বলুন তো? পারেন তো একটু বিকাশ ভবন-এ গিয়ে একটু তদ্‌বির করে দেখুন, তাতে মনে হয় এ বিষয়ে আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবেন।

স্যার আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আজ তা হলে আসছি স্যার, নমস্কার। প্রয়োজন হলে আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসব কিন্তু। বলতে বলতে ওরা অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। এবার অর্ক বলল, তিয়াসা খুব খিদে পেয়েছে। চল হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে নি।

ঠিক আছে, তাই চলো। আগে খেয়ে নেওয়া যাক্, বেলা এখন প্রায় আড়াইটা বাজে।

আমার পছন্দের হোটেলে খেতে কোনো আপত্তি নেই তো?

কি যে বলো তুমি, তোমার পছন্দই এখন আমার পছন্দ। কথা না বাড়িয়ে চলো তো।

অর্ক তিয়াসাকে নিয়ে একটা সাধারণ হোটেলে গিয়ে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়ল। তিয়াসা হোটেলের অবস্থা দেখে একটু অবাক হয়েছিল। অর্ক সেন, তাকে নিয়ে এরকম একটা হোটেলে উঠল। মনে মনে ভাবছিল সে, এমন সময় বেয়ারা এসে ভাত দিয়ে গেল। সঙ্গে ডাল, শুক্তো, পোস্ত বড়া। সে আরও বেশি বিস্মিত হল মেনু দেখে। এমন সময় অর্ক বলল, কি হল তিয়াসা, হাত গুটিয়ে বসে বসে ভাববে না খাবে? অগত্যা, চুপচাপ খাওয়াদাওয়া সেরে হোটেলের বিল মিটিয়ে তারা রাস্তায় নামল। এখন প্রায় পৌনে চারটে বাজে। এবার বাড়ি ফেরার পালা। তিয়াসা বলল, অর্ক, চলো আর রিকশা করব না, বাসস্ট্যান্ডে হেঁটে হেঁটেই যাওয়া যাক।

বেশ তো তাই চলো, খাবার পরে একটু হাঁটাহাঁটি করা ভালো।

তা তো এখন বলবেই। আচ্ছা অর্ক একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবে না বল?

কি বলতে চাও, স্বচ্ছন্দে বলে ফ্যালো, অত হেঁয়ালি করতে হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কথায় কিছু মনে করব না।

তা হলে বলি, তুমি ওরকম একটা হোটেলেই বা উঠলে কেন? আর ওরকম ডাল পোস্তই বা খেলে কেন? টাকাটা যখন আমি দেব, তখন অন্য কিছু খেতে পারতে। আমার সামনে বসে ডাল পোস্ত ভাত খেলে আমার ভালো লাগে বলো? জীবনের প্রথম দিন তুমি আমি এক টেবিলে বসে খেলাম। আজ আমার এতবড়ো আনন্দের দিন। ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেছি জানো?

আমার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা?

হ্যাঁ অর্ক, তোমার জন্যে ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করি তুমি কবে আবার আমার বাড়িতে আসবে, তোমাকে দুচোখ ভরে শুধু একটিবার দেখব। কথায় কথায় আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ কিন্তু।

শোনো তিয়াসা। সাধারণ হোটেলেই আমি খাই। এটা আমার অভ্যেস। আর মেনুর কথা বলছ, মনে রেখো তুমি একজন হিন্দু ঘরের বিধবা। তুমি ডাল ভাত খাবে, আর আমি মাছ ভাত খাব তোমার সামনে বসে, এ আমি কিছুতেই পারতাম না।

ঠিক আছে অর্ক। তুমি ঠিক বলেছ, আমার তো মনেই ছিল না যে, আমি বিধবা। তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছ অর্ক। আর তোমার খাবার ব্যাপারেও আমার প্রতি সহমর্মিতা দেখে, সত্যিই আমি বিস্মিত। আচ্ছা অর্ক, তুমি জানো, বিধবাদের কি কি খেতে নেই, কি কি করতে নেই? তুমি একটা তালিকা করে আমাকে দেবে তো, আমি তো সব জানি না, তাই বলছি।

কথাগুলো বলতে বলতে তিয়াসার গলার স্বর বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া তার চোখের পাতাও ভিজে গিয়েছিল। সে রুমালে যখন চোখ মুছতে ব্যস্ত তখন অর্ক ফিরে তাকাতেই দেখে ফেলেছিল। তার পর হাঁটা আর হাঁটা। বেশ কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা ছিল না। একসময় স্ট্যান্ডে এসে একটা বাসে দুটো সিট জোগাড় করে বসে পড়ল, তখনো বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল তিয়াসাকে। অর্ক ব্যাপারটা বুঝেছিল, কেন সে কাঁদছিল, বা এখনের এই গম্ভীর হয়ে থাকার রহস্যটা কি?

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর সাড়ে চারটা নাগাদ বাস ছেড়ে দিল। একসময় শহর ছাড়িয়ে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝ দিয়ে কালো পিচঢালা রাস্তা ধরে বাসটি ছুটতে লাগল। তিয়াসা জানলার ধারে বসে বিকেলের নরম রোদ মাখতে মাখতে, ভাবনার সাগরে ডুবে গিয়েছিল। সে ভাবছিল, বাসের মধ্যে দুজনে একই সিটে বসে জানালার ফাঁক দিয়ে নিজের মনটাকে উড়িয়ে দিতে, বেশ ভালোই তো

লাগছে, নরম রোদ্দুর, ঠান্ডা বাতাস, সবুজ ভরা মাঠ, এ এক পৃথিবীতে ভেসে বেড়াতে পারলে কার না ভালো লাগে? কিন্তু মনের মানুষটি যদি পাশে থেকেও না থাকার ভান করে থাকে তাহলে? তবুও ভালো লাগে। সে ভালোলাগার মধ্যে থাকে বেশ মজা। প্রকৃতির নতুন নতুন চেহারা দেখতে দেখতে আড়চোখে দুজন-দুজনকে ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে দেখে নেওয়া, এ যেন এক আলাদা অনুভূতি, আলাদা মজা পাওয়া যায়।

এইভাবে কত গ্রাম, কত শহর, কত মাঠ, কত নদী, কত গাছপালা, কত মানুষজন, সব কিছুকে ছাড়িয়ে বাস ছুটে চলেছে তার গন্তব্যের দিকে। দুজনেই চুপচাপ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। তারই ফাঁকে আকাশটা কখন যে কালো মেঘে ঢেকে ফেলেছে তারও হুঁশ ছিল না। তিয়াসা প্রথম দেখল পশ্চিমের আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। সেই কালো মেঘের নীচে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একঝাঁক বলাকা। তিয়াসা তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অর্ককে দেখিয়ে বলছে, দ্যাখো-দ্যাখো অর্ক কি সুন্দর দেখাচ্ছে। অর্ক এবার জানলার ফাঁক দিয়ে চোখ রাখল, দৃশ্যটি দেখে সে বলল বাঃ কি সুন্দর।

তিয়াসা বলল, অর্ক তুমি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলে কেন?

বেশি কথা বলা আমি পছন্দ করি না, তাই।

এর মধ্যে আবার বেশি কথা কোথা থেকে এল অর্ক। প্রায় অর্ধেক রাস্তা তো আমরা চুপচাপই চলে এসেছি। কেউ কোনো কথা বলিনি, তবুও?

আচ্ছা সব কথাতেই তোমার খুঁত খুঁজে বেড়ানো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গ্যাছে। তোমার সঙ্গে সাবধানে কথা বলতে হবে দেখছি।

হয়তো হবে। তবুও বলব এখনো তোমার রাগ কমেনি দেখছি। নিরামিষ খাওয়া নিয়ে বলেছিলাম বলে তুমি মনে মনে খেপে রয়েছ দেখছি। আচ্ছা তুমি এটা কেন বুঝতে চাইছ না, যে-কোনো পুরুষ মানুষ একজন মহিলার সামনে ওভাবে খাবে, এটা আমিও মেনে নিতে পারি না। আমি না হয় খেতে পারি, তোমার কিন্তু নিদেনপক্ষে মাছ খাওয়া উচিত ছিল। আমি তা হলে খুব খুশি হতাম।

শোনো তিয়াসা, বিষয়টাকে তুমি তোমার মতো করে ভাবছ বলে এটা তোমার মনে হচ্ছে। তুমি যদি সার্বিকভাবে ভেবে দ্যাখো, তাহলে তোমারও ভালো লাগবে।

কিরকম?

যেমন ধরো, আজ তোমার টাকায় মাছ মাংস দিয়ে ভাত খেলে তুমি খুশি হতে,

আবার ধরো কোনো গরিব মানুষের টাকায় যদি ওই খাবারটা খেতে ইচ্ছে করে তখন সেই গরিব মানুষটাকে বিপদে ফেলা হবে না কি?

তা হয়তো হবে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার তুলনা করাটা কি ঠিক হচ্ছে?

কেন ঠিক হচ্ছে না। ধরো, আমি যদি রোজ ডালভাত খাওয়া অভ্যাস করি, তা হলে আমার কোনো অসুবিধে হবে না, আর যদি রোজ মাছ ভাত খাওয়া অভ্যেস করি, তা হলে কিন্তু আমার ডাল ভাত খেতে অসুবিধে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা যাদের জন্যে কাজ করি, তাদের বেশিরভাগটাই অসহায়।

ঠিক আছে মশাই, আমার ঘাট হয়েছে, আর বলব না। তুমি যা পছন্দ করবে তাই খেয়ো।

শুধু আমি নয়, তোমাকেও এইভাবে অভ্যেস করতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে তোমারও কষ্ট হবে। তুমি যখন নীল নিঃশব্দে নাম লিখিয়েছ তখন আমাদের পথ ধরেই চলতে হবে। এই কথাটা ভুললে চলবে কেন?

নীল নিঃশব্দে কিছুদিন যাতায়াত করলে সব অভ্যেস করে নেব, তুমি দেখে নিয়ো। তুমি কি পছন্দ করো, কি অপছন্দ করো, সব তখন জেনে বুঝে নেব। হিন্দু বিধবাদের তো অনেক নিয়ম মেনেই চলতে হবে সমাজে, না হলে বদনামের ভয় আছে।

হঠাৎ একসময় ঝড় উঠল প্রবল বেগে। তার সঙ্গে শুরু হল ঝাপটা দিয়ে বৃষ্টি। ঝড়ের গতিবেগ এত বাড়তে লাগল, যে রাস্তার মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ড্রাইভার বাসটি থামিয়ে দিতে বাধ্য হল। সবাই জানালা বন্ধ করে ভগবানকে ডাকতে লাগল। মাঝে মাঝে বজ্রপাতের শব্দে কান ঝালাপালা হবার জোগার। তিয়াসা ভয় পেয়ে অর্কর একটা হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে দুহাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। অর্ক সেই মুহূর্তে কোনো কিছু বলতে পারল না। একরকম বাধ্য হয়েই সহ্য করল সে তিয়াসার এই অন্যায়টুকু। তিয়াসা এই অবস্থায় পড়ে অর্কর হাত চেপে ধরার সুযোগ পেয়ে নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল, আর ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে। এমন ঘটনা না ঘটলে হয়তো এই সুযোগ জীবনে সে পেত কিনা বলা যায় না।

একসময় ঝড়বৃষ্টি থামল। বাসটি এগোতে থাকল গন্তব্যের দিকে। যাত্রীরা সব হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সবাই এবার জানালা খুলে দিয়ে একটু ঠান্ডা বাতাসের আশায় উন্মুখ হয়ে ছিল। কিন্তু ভাগ্য সেদিন বোধহয় সবার বিরূপ ছিল। কিছুটা আসার পর দেখা গেল রাস্তার উপর বড়ো একটা গাছ উপড়ে পড়ে রয়েছে। বাস থেকে

নেমে অনেকেই দেখছেন, আবার কি বিপদ, মাঠের মাঝখানে এভাবে কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে। আস্তে আস্তে তো এবার অন্ধকার নেমে আসবে। এই অন্ধকারের মধ্যে যাত্রীরা কি করবে, কোথায় যাবে, সবাই যখন ভাবতে ব্যস্ত তখন দেখা গেল দূরের গ্রাম থেকে পুরুষ মহিলারা কুড়ুল কাটারি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সবাই খুব ভয় পেয়েছিল তাদের আসতে দেখে, কিন্তু তারা এসেই গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। শুধু তাই নয় তাদের ভাগাভাগি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। গাছটা বড়ো ছিল বলে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল ঠিকই কিন্তু ভাগাভাগির জেরে কিছুটা তাড়াতাড়িই রাস্তা সাফ হয়ে গেল। তবুও রাত্রি আটটা বেজে গেছে এই অবস্থায় গাড়ি আবার এগোতে লাগল।

তিয়াসা তখনও অর্কর হাত ছাড়েনি, চুপচাপ সে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। অর্কও ছাড়াবার চেষ্টা করেনি। গাড়ি যখন কানপুরে এসে পৌঁছোলো তখন রাত ন-টা বেজে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। ঝড়বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ নেই গোটা কানপুর জুড়ে। আলো-আঁধারি অবস্থা। তিয়াসাকে নিয়ে কোনোরকমে এসে বন্ধুর দোকানে পৌঁছোল। সাইকেলটা বের করে যাবার উদ্যোগ করতেই বন্ধুটি বলল, অর্ক, অন্ধকারে যাবি কি করে, এক কাজ কর, আমার টর্চটা নিয়ে যা; আগামীকাল কারো হাত দিয়ে পঠিয়ে দিস।

অর্ক তার কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে মধুপুরের রাস্তায় পৌঁছোল। তিয়াসা তার পেছন পেছন হেঁটে আসছিল। এবার অর্ক সাইকেলে চড়ে বসল। তিয়াসাও জলকাদার মধ্যেই সাইকেলে উঠে বসল। যদিও রাস্তাটা মোরাম ঢালা তবুও খানখন্দে ভর্তি। তার উপর অন্ধকার। রাস্তায় তেমন লোকজনও নেই। এমন সময় সামনের চাকাটা একটা গর্তে পড়ে যেতেই অর্ক কোনোরকমভাবে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। সামনের দিকে রাস্তা আরও খারাপ। অগত্যা দু-জনে হাঁটতে লাগল।

রাস্তায় এখানে ওখানে জল জমে রয়েছে, নিঃস্তব্ধ চারদিক। শুধু ঝি-ঝি পোকা আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। তিয়াসা এতক্ষণ অর্কর পেছন পেছন আসছিল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেয়ে ভয়ে পেছন থেকে অর্ককে জড়িয়ে ধরেছে। অর্ক টর্চের আলো ফেলে দেখে একটা শেয়াল রাস্তা পার হয়ে চলে যাচ্ছে। শেয়ালটাকে দেখিয়ে বলে অর্ক, আচ্ছা শেয়াল দেখে যদি অত ভয় পাও তা হলে তো রাস্তাঘাটে বেরুতে পারবে না।

আমি কি অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম, শেয়াল না ওটা বাঘ?

তা হয়তো পাওনি, কিন্তু মধুপুরের রাস্তায় বাঘ আসতে পারে, এটা ভাবলে কি করে? যেভাবে ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরলে, মনে হল যেন কি একটা কি ঘটে গেছে। তা ছাড়া আমরা তো পরিচিত জায়গায় পৌঁছে গেছি। এবার আমাদের সাবধানে যেতে হবে। তা না করে অমন করে জড়িয়ে ধরলে, কেউ যদি দেখে ফেলতো, তা হলে কি হত বলো তো?

কি আর হত। সবাই দেখত। তিয়াসা বলে একটি মেয়ে অর্ক সেনকে জড়িয়ে ধরেছে। তা ছাড়া সে তো আর এমনি এমনি জড়িয়ে ধরেনি, সে তার প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরেছে।

খুব সাহস হয়ে গেছে দেখছি তোমার। সমাজ বলে একটা কিছু এখনো আছে, এটা ভুলে যেয়ো না। তার উপর শংকরদারা তো রয়েইছে। থাক আমরা নীল নিঃশব্দের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখনো ভেতরে আলো জ্বলছে দেখছি। মনে হয় শুভেন্দু মুখার্জি আমাদের ফেরার অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

শুভেন্দু ছেলেটা তোমায় খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে তাই না?

তা তো করেই। ছেলেটি নিঃসন্দেহে খুব বিশ্বাসীও বলতে পারো। এরকম দু-চারটে ছেলে যদি পেতাম, তাহলে নীল নিঃশব্দকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে পারতাম। যাক আমরা এসে গেছি। এসো ভেতরে এসো।

দু-জনেই ভেতরে ঢুকে দ্যাখে, সবাই চলে গেছে শুধু একা শুভেন্দু বসে বসে কি একটা বই পড়ছিল আপন মনে। অর্ক ঢুকেই বলল, শুভেন্দু তুই একা বসে আছিস যে, সবাই চলে গেছে বুঝি? শুভেন্দু বলল, এই একটু আগে সবাই চলে গেল। তোমাদের ফিরতে দেরি দেখে সবাই খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। যাক তোমরা যে ভালোয়-ভালোয় পৌঁছে গেছ, আর চিন্তা রইল না।

ঠিক আছে শুভেন্দু, আমরা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আটকে পড়েছিলাম। রাস্তার উপর একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়েছিল, গাড়ি পার হতে পারেনি তাই এত দেরি হয়ে গেল। এদিককার খবর কি?

এদিকে বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ঝড়ের গতিবেগ তেমন তীব্র ছিল না। ঝোড়ো বাতাস এসেছিল তবে সেরকম ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি।

ঠিক আছে শুভেন্দু, তুই এক কাজ কর, তিয়াসাদেবীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়। রাত অনেক হয়েছে। তুই ফিরে এলে বাড়ি যাব।

শুভেন্দু অর্কর কথামতো তিয়াসাদেবীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল। তারপর দুজনে নীল নিঃশব্দে তালা বন্ধ করে বাড়ি ফিরে গেল।



পরের দিন সকালবেলা অর্ক যথাসময়ে নীল নিঃশব্দে এসে পৌঁছোল। এদিকে মন্টু, শুভেন্দুরা তার আগেই এসে বসেছিল। অর্ক পৌঁছেই বলল, দ্যাখ শুভেন্দু, তোদের সেদিন যে চাকরির কথা বলছিলাম, তার জন্যে একটা কাজ আমাদের করতে হবে। যেমন ধর, এই নীল নিঃশব্দে এসে তোদেরকে আমার গাইডলাইন মতো পড়াশোনা করতে হবে। কোথাও কোনো অসুবিধা হলে আমরা অন্যের সাহায্য নেব। আর পরীক্ষা দেবার জন্য যেসব বইপত্র লাগবে, তাও আমি তোদের কিনে দেব, কিন্তু পড়াশোনাটা তোদের করতে হবে। এতটুকুও ফাঁকি দেওয়া চলবে না। কি, তোরা রাজি আছিস তো?

ওরা একসঙ্গেই বলে উঠল, আমরা রাজি আছি অর্কদা। নীল নিঃশব্দের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের কোচিং দিতে লাগল অর্ক সেন। কোথাও আটকালে সে তার বাবাকে নিয়ে এসে তার সমাধান করতে লাগল। শুভেন্দুদের পড়বার প্রতি আগ্রহ দেখে রঞ্জনবাবুও খুব খুশি হলেন। তিনি তাদের সাধ্যমতো গাইড করতে লাগলেন। অর্ক বাবার ও শুভেন্দুর কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখে অভিভূত হয়ে গেল।

এইভাবে শুভেন্দুদের কোচিং-এর পাশাপাশি তিয়াসাদেবীর চাকরির বিষয়টিও সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখছিল অর্ক সেন। দিনকয়েক বাদে ডি. আই-র কথামতো তিয়াসাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন কলকাতা গেল অর্ক সেন। বিকাশ ভবনে পৌঁছেই খোঁজ নিল সে এ ব্যাপারে কে সাহায্য করতে পারে। হঠাৎ খোঁজ করতে গিয়ে দ্যাখে, তার এক বন্ধু তাকে ডাকছে।

অর্ক তো প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিল, এখানে আবার কে তাকে ডাকবে। কাছে গিয়ে দ্যাখে শঙ্খ ব্যানার্জি। বহুদিন তারা একই হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছে। শঙ্খ অর্ককে জিজ্ঞেস করল, কিরে এখন কি করছিস?

না ভাই তেমন কিছু করছি না। তবে কিছু কিছু সমাজসেবা করি।

ছিঃ ছিঃ তোদের দাঁড় করিয়ে রেখে কেমন গল্প করছি দ্যাখ। দুটো চেয়ার দেখিয়ে বলে, তোরা বোস একটু, আমি আসছি।

শঙ্খ ফিরে এসে বলে, কি খাবি বল? চা, কফি, ঠান্ডা, তোদের যেটা পছন্দ সেটাই বল।

না-না, কিছু খাব না, অর্ক বলল।

শঙ্খ বলল, আহা অমন সংকোচ করছিস কেন? কতদিন পরে দেখা হল বল তো? না খেলে ছাড়ছে কে। হঠাৎ বেল বাজালো শঙ্খ। একজন পিয়োন এসে দাঁড়াল তার সামনে। শঙ্খ বলল, হালকা টিফিন আর চা নিয়ে এসো তিনজনের জন্য। লোকটি নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। তারপর শঙ্খ জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বল তো, তোর বাড়ি শুনেছিলাম তো মেদিনীপুরের কোন এক অখ্যাত গ্রামে। তা বন্ধু অতদূর থেকে কিসের জন্য এসেছিস বল দেখি?

শোন শঙ্খ। এই যে ভদ্রমহিলাকে দেখছিস, এনার নাম তিয়াসা সমাদ্দার। এনার স্বামী একটা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। মাস কয়েক হল তিনি পরলোকগত হয়েছেন। বর্তমান সরকার বাহাদুরের আইন অনুযায়ী স্বামীর চাকরিটি তিয়াসাদেবী পাবেন। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ডি. আই অফিস কোনোভাবেই তিয়াসাদেবীকে পাত্তা দিচ্ছেন না। অতএব তিয়াসাদেবী আমাদের শরণাপন্ন হন। আমরা ওনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব এইরকম আশ্বাস দিই। একদিন ওনাকে নিয়ে ডি. আই. সাহেবের কাছে যাই। তিনি বললেন, আপনারা কলকাতায় বিকাশ ভবনে যান। তা হলেই বিষয়টা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতএব ডি. আই-এর কথামতো এখানে এসেছি বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করতে, কি অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

আচ্ছা অর্ক, উনি সমস্ত কাগজপত্র ঠিকঠাক জমা দিয়েছেন তো?

অর্ক তিয়াসার কাছ থেকে ফাইলটা নিয়ে শঙ্খর হাতে ধরিয়ে দেয়। শঙ্খ ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। তখন চা জলখাবার আসে। জলখাবার খেয়ে চা খেতে খেতে আবার বেল বাজিয়ে একটি লোককে ডাকল। পড়িমরি করে একজন লোক এসে দাঁড়ালো শঙ্খর টেবিলের সামনে। শঙ্খ তাকে বুঝিয়ে বলল, অমুক ফাইলটা খুঁজে নিয়ে এসো। লোকটি চলে গেলে পর শঙ্খ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা অর্ক, কোনো রাজনীতি করিসনি তো?

না, আমি কোনো ধরনের রাজনীতিকে পছন্দ করি না। তা ছাড়া বর্তমান দিনে রাজনীতির কি হাল হকিকত, তা-তো দেখতেই পাচ্ছিস। অতএব ওসব আমার পছন্দের বাইরে।

তা হলে করিসটা কি? যা দেখে তিয়াসাদেবীরা ভরসা পান?

আমি পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে ফিরে একটা সংস্থা খুলেছি। যার নাম দিয়েছি নীল নিঃশব্দ। সেই সংস্থার সঙ্গে বহু শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক জড়িয়ে

পড়েছে। আবার তিয়াসাদেবীও কিছুদিন হল আমাদের নীল নিঃশব্দের সদস্যা হয়েছেন।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু নীল নিঃশব্দের কার্যক্রমটা কি?

নীল নিঃশব্দের কাজ হল অসহায়, আর্ত মানুষের সেবা করা। তাদের আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু আরও আছে। কোন অর্থবান পুরুষ বা মহিলা যদি মনে করেন আমাদের সাহায্য নেবেন, তা হলে তাঁদেরও আমরা সাহায্য করে থাকি।

বাঃ অর্ক, বাঃ এ যে কোনো সিনেমার গল্প শুনলাম মনে হচ্ছে।

তা কেন হবে শঙ্খ। যা বললাম, তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। তা ছাড়া আমি তোকে নেমতন্ন করে যাচ্ছি, যে-কোনোদিন সময় করে আমাদের গ্রামে আয়। আশা করছি তোর ভালো লাগবে। আমার গ্রামের ঠিকানা তো অনেকবার নিয়েছিস, কিন্তু একবারের জন্যেও কি ইচ্ছে করে না বাংলার গ্রামগুলোকে একটু দেখে আসি। তোরা যারা শহরের মধ্যেই নিজেদেরকে বেঁধে রাখতে চাস, কি হবে তোদের গ্রামে গিয়ে। তোরা তো জানতে চাস না গ্রামের মানুষগুলো কি অবস্থায় আছে। তারা কত কষ্ট করে তোদের ভাত-ডাল রুটির জোগান দিয়ে যাচ্ছে।

যাক ভাই অর্ক আর আমাকে বৃথা ল৭ ৷ দিস না। এবার কথা দিচ্ছি পুজোর ছুটিতে নিশ্চয় যাব তোর গ্রামে। তোর নীল নিঃশব্দকে দেখতে। জানিস অর্ক নীল নিঃশব্দ নামটা কিন্তু ফাটাফাটি।

ফাইলটা খুঁজে নিয়ে এসে লোকটি বলল, স্যার ফাইলটা অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়েছি। মনে হচ্ছে কেউ ফাইলটাকে লুকিয়ে রেখেছিল। আসছি স্যার। লোকটি চলে গেল, তারপর ফাইলটি খুলে দেখে শঙ্খ বলল, অর্ক, ফাইলে কারও কালো হাত লেগে গেছে। অতএব এই ফাইল আর হাতছাড়া করা যাবে না। এই আমার লকারে তালা বন্ধ করে রাখলাম। আর কারও হাত না লাগে। বাকি কাজটা আমি শেষ করে ঠিক সময় মতো ডি. আই সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেব। শুধু তাই নয়, তিনি যাতে সাত দিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য থাকেন তার ব্যবস্থাও করে পাঠাব। তুই নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যা, কেউ আর কিছু করতে পারবে না।

হ্যাঁরে শঙ্খ, তুই বিয়ে করেছিস?

বিয়ে করার আর সময় পেলাম কোথায়? তা ছাড়া পছন্দমতো মেয়ে পাব কোথায়? পারিস তো একটা মেয়ের সন্ধান করে রাখিস। শুনেছি গ্রামের মেয়েরা নাকি এখনও শহরের মেয়েদের তুলনায় খানিকটা ভালো।

ঠিক আছে শঙ্খ, অনেক ধন্যবাদ তোকে। তবে পুজোর ছুটিতে মধুপুর যেতে ভুলে যাসনে যেন। তোর রাজকন্যে তোর পথ চেয়ে বসে থাকবে। তোর ফোন নম্বরটা আমার ডায়েরিতে লিখে দে, না হলে হয়তো কখন ভুলে গিয়ে বসে থাকবি। আর নয় ভাই শঙ্খ। এখন প্রায় দুটো বেজে গেছে। আসছি তা হলে এখন। আবার দেখা হবে।

তিয়াসাদেবী নমস্কার জানাতে ভুল করলেন না শঙ্খবাবুকে। শঙ্খও প্রতিনমস্কার জানাল।

তারপর বিদায় নিয়ে আবার রাজপথে পা নামিয়ে পাশাপাশি ওরা হাঁটতে লাগল। এবার কিছু না খেলেই নয়। দুজনে একটা হোটেলে উঠে ডাল ভাত খেয়ে নিয়ে আবার সেই রাজপথ। আজ আর খাওয়া নিয়ে তিয়াসা কোনো উচ্চবাচ্য করল না, অর্ক ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি। তারপর সোজা হাওড়ার বাস ধরে হাওড়ায় পৌঁছে গেল। যখন ওরা হাওড়ায় পৌঁছোলো তখন প্রায় পৌনে চারটে বেজে গেছে। কোনোরকম দেরি না করে ছুটতে ছুটতে হাওড়াতে দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ডে এসে হাজির হল। তিয়াসার দম বন্ধ হবার জোগার। এত ছোটাছুটির ধকল সে সইতে অভ্যস্ত নয়। তবুও হাওড়া-সুরজপুর বাস তাদের কানপুরের উপর দিয়েই যায়। অতএব ওরা বাসে উঠে একটা টু-সিট নিয়ে বসে পড়ল। তিয়াসা বলল অর্ক জল খাব। এই নাও টাকা এক বোতল জল কিনে নিয়ে এসো।

অগত্যা অর্ক এক বোতল জল নিয়ে এসে তিয়াসার হাতে দিয়ে বলল, বাড়ি থেকে জল নিয়ে এলে দশটা টাকা অযথা খরচ হত না। এক সময় গাড়ি ছেড়ে দিল। তিয়াসা আবার সেই জানালার ধারে বসে দু-চোখ ভরে দেখতে লাগল শহরটাকে। তারপর ওভারব্রিজ পেরোবার সময় দেখল রেললাইনের সারি। তারপর বাস, লরি, ট্যাক্সির তো শেষ নেই। সে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল সব কিছু।

অর্ক চুপচাপ বসে বসে কি যেন ভাবছিল। সে তিয়াসার পানে ফিরেও দেখেনি। তার শুধু একটাই ভাবনা, তারা পৌঁছোবে কখন। তিয়াসা সঙ্গে আছে বলেই তার এত ভাবনা। না হলে একা থাকলে অর্ক সেনের ভাবনা কি? একসময় গাড়ি যখন হাই রোডে উঠল তখন তিয়াসা অর্ককে বলল, —আচ্ছা অর্ক, তুমি এত অন্যমনস্ক কেন? তোমার পাশে যে একজন সুপরিচিতা মহিলা বসে আছে সেদিকে তোমার কোনো হুঁশই নেই মনে হচ্ছে। এমন ভাব দেখাচ্ছ যে, তুমি আমাকে চেনোই না। আচ্ছা অর্ক তুমি এগুলো কি করে পারো বলো তো?

তুমি আমাকে কি ভাবো আগে বলো।

আমার ভাবনা তো তোমাকে বলেছি একদিন। নতুন করে আবার শুনতে চাও?

না, তিয়াসা, আর তোমাকে শোনাতে হবে না। যা শুনেছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। এবার তুমি বলো, আমায় নিয়ে তোমার পরিকল্পনা কি?

মনে মনে তো অনেককিছুই ভাবি তোমাকে নিয়ে, কিন্তু সব কথা তো বলা যাবে না, তা হলে যে আমার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। তাছাড়া মেয়েদের এমন কিছু কথা থাকে, যে-কথা সবসময় পুরুষ মানুষকে বলা যাবে না।

থাক তোমার গোপন কথা, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তবে একটা কথা ঠিক, মেয়েরা যে সত্যিকারের কি চায়, তা বোধহয় ঈশ্বরও জানেন না!

না, তিনিও জানেন না। কথায় আছে না, 'দেবা ন জানন্তি'। অতএব জানার কৌতুহল থাকাও ভালো না। তবে কি জানো অর্ক, তোমার কাছে আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা। যেহেতু আমি বিধবা হয়েও তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তুমি আমায় আদৌ ভালোবাসো কিনা, সে ব্যাপারটা জানার আমারও কোন আগ্রহ নেই। কারণ তুমি আমাকে যদি জীবনে কোনোদিন ভালো না বাসো, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমি তোমাকে ঠিক ভালোবেসে যাব।

তোমার কি ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কথা নেই? আমার মতন একটা বেকার বাউন্ডুলে ছেলেকে তোমার এত ভালো লেগে গেল যে তুমি আমায় ভালোবেসে ফেললে। সত্যিই তোমার জুড়ি নেই। দুদিন পরে তুমি চাকরি পেয়ে যাবে, তখন কত ভালো ভালো চাকরি করা ছেলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাবে। আর তুমি কিনা একটা অকর্মার ঢেঁকিকে নিয়ে মজে বসে রইলে?

অতসব বুঝি না, আমার যা ভালো লাগে, সেটা অন্যের ভালো নাও লাগতে পারে, তাই বলে আমার ইচ্ছেটাকে তো আর মেরে ফেলতে পারি না।

তা নাহয় নাই পারলে, তাই বলে ভালো কি মন্দ সেটা দেখবে না?

তুমি কি ভাবছ, আমার ভালোমন্দের কথা আমি বুঝি না। খুব ভালো করে বুঝি। আমার চাওয়া অন্যের চাওয়ার সঙ্গে মিলবে, এমন তো কোথাও কিছু লিখিত-পড়িত করা নেই। তা ছাড়া আমি যা ভালো বুঝেছি, তাই করেছি। এ-নিয়ে কেউ বলতে এলে তাকে আমি ছেড়ে কথা বলব না।

তোমার জিদ তো বড়ো কম নয়?

জিদ্ না থাকলে, এতখানি আত্মবিশ্বাস পেতাম কোথায়? আর এই আত্মবিশ্বাস

না থাকলে, কোনো মানুষই তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারত না। যে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে না, সে অপরের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে কি করে বলতে পারো অর্ক। এই যে ধরো, তোমার আত্মবিশ্বাস কতখানি দৃঢ়। তার জন্য তুমি চাকরি-বাকরির চেষ্টা না করে দেশ-সেবা করবে বলে নীল নিঃশব্দ তৈরি করে বসে আছো। এই যে তোমার জীবনপ্রবাহ, ক-জন মানুষের মধ্যে এই প্রবাহ বয়ে চলেছে বলতে পারো?

না তা নয়। তবুও ভেবে দেখলে হত না?

এর পরেও তুমি আমায় ভাবতে বলছ! না অর্ক, আমার আর নতুন করে ভাববার কিছু নেই। আচ্ছা, তুমি কি জানতে, আমি এই প্রথম কলকাতা দেখলাম। যখন তুমি আমায় বলেছিলে অমুক দিনে কলকাতা যেতে হবে, সেই দিন থেকে খালি ভেবেছি, সেই মুহূর্তটা কখন আসবে। আমি কখন সুন্দরী কলকাতা দেখব। তারপর ভেবেছি, হাওড়া ব্রিজ, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, ব্রিগেড প্যারেড ময়দান, সব তোমাকে নিয়ে দেখব। তাতে যদি দিন দুয়েক থাকতে হয় তাও থাকব। কিন্তু কিছুই হল না আমার।

বললেই পারতে, বললে না কেন?

বারে, কি করে বলব, তুমি যদি মুখের ওপর না বলে দিতে, তা হলে আমি যে ল৭ ায় মরে যেতাম। সব থেকে বড়ো কথা হল তোমার মান রক্ষা করতে গিয়ে আমার দেখবার আশাটাকে গলা টিপে চুপ করিয়ে রাখতে হয়েছে। দুটো রাত নয়, শুধুমাত্র একটা রাত যদি আমরা চরম বিপদে পড়ে কোথাও কাটাই, তা হলে মধুপুরের লোকেরা আমাদের নিয়ে নানা ধরনের রসালো গল্প ফেঁদে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে বেড়াবে। আর তোমার মতন মানুষের এতটুকু সম্মানহানি হোক, এ আমার অভিপ্রেত নয়।

আমায় কেউ অসম্মান করুক, এটা তোমার পছন্দ নয়, তাই তো?

ঠিক তাই, আর সেই অসম্মানের কারণ যদি আমি হই, তাহলে তো কোনো কথাই নেই।

দেখা যাবে তিয়াসা, সময় সুযোগ এলে তখন বোঝা যাবে। তবে এটুকুও জেনে রাখো তিয়াসা, আমাকে নিয়ে তোমার জীবনপ্রবাহ সঠিক খাতে বইবে না। সমাজ তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

তাতে কি হবে? এই সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব বলেই তো নীল নিঃশব্দে নাম লিখিয়েছি। তা হলে ভয় কাকে পাব?

কেন শংকরদা আছে না। তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ, সে তোমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছ। একদিন না একদিন ঠিক তার প্রতিশোধ নেবে। তখন তোমার অর্ক সেনকেও ওরা ছাড়বে না। হাড়-মাংস সব চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।

তখন তুমি কি চুপ করে বসে বসে দেখবে?

হয়তো ওরা তার আগেই আমাকে শেষ করে দিল, তখন তুমি কি করবে?

তুমি ভুল করছ অর্ক, তুমি মেয়েদেরকে চেনো না। আমি তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি, ওদের প্রত্যেককে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব তাহলে।

যাক আর-এক শুভেন্দু পাওয়া গেল। শুভেন্দুও প্রায় ওই কথাটাই বলে। তোমরা দুজন আমার খুব ভালো চাও, এটা বুঝতে পারলাম। শুধু তফাত এই যে তুমি নারী, আর সে পুরুষ।

এতসব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে চারঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে গেছে তারা বুঝতে পারেনি। গাড়ি একসময় কানপুর এসে থামল। ওরা গাড়ি থেকে নেমে সাইকেলে করে নীল নিঃশব্দে পৌঁছে গেল। শুভেন্দু যথারীতি তিয়াসাদেবীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল।

অর্ক মন্টুদের নিয়ে বসেছিল। শুভেন্দু ফিরে আসতেই অর্ক জিজ্ঞেস করল, পড়াশোনা কেমন চলছে। শুভেন্দু উত্তর দিল খুব ভালো। এ-ভাবে কোচিং পেলে আমরা খুব শিগগির চাকরি পেয়ে যাব। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো দিয়ে যা, তা হলেই হবে, অর্ক বলল।

শুভেন্দু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, অর্কদা রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, চলো এবার উঠে পড়া যাক। সবাই একসাথে বেরিয়ে পড়ল নীল নিঃশব্দের কাছে সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে।

এদিকে শংকরদার কানে কথাটা কে তুলে দিয়েছে যে অর্ক সেনের সঙ্গে তিয়াসা সমাদ্দার কোথায় যাচ্ছে আজকাল। কথাটা তার কানে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। সে মনে মনে ঠিক করল আর নয়, এবার ওদের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কারণ অর্ক সেন যদি তিয়াসার চাকরির ব্যাপারে হাত লাগায় তা হলে বিষয়টা নিয়ে তো ভাবা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

শংকরদার যেই ভাব সেই কাজ। একদিন দলবল নিয়ে সোজা তিয়াসা সমাদ্দারের বাড়ি। তিয়াসা বাড়িতেই ছিল। বাইরে চিৎকার চ্যাচামেচি শুনে পরি দরজা খুলে দেখে গিয়ে তিয়াসাকে বলল, শংকরদারা অনেক লোক এসেছে আর তোমাকে নিয়ে কি সব নোংরা নোংরা কথা বলছে।

একসময় দরজায় কড়া নাড়তে লাগল শংকরদার এক চ্যালা। পরি এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, কাকে চান? শংকরদা এগিয়ে গিয়ে বলল, আমরা তোমাদের তিয়াসা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তিয়াসা মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল ওদের। তিয়াসাই বলল, পরি ওনাদের আসতে বলো। শংকর ও আরও দু-চারজন ভিতরে ঢুকল। তিয়াসা সকলকে বসতে অনুরোধ করল। কিন্তু শংকরদা চিৎকার করে বলল, আমরা আপনার বাড়িতে বসে চা-জলখাবার খেতে আসিনি। আমরা এসেছি আপনাকে সাবধান করতে। যদি আর কোনোদিন অর্ক সেনকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছেন তা হলে তার ফল কিন্তু ভালো হবে না বলে দিয়ে গেলাম। এই তোরা সব চল, আজ আর বেশি না। না হলে আবার তিয়াসাদেবী লব্ ায় গলায় দড়ি দিতে বাধ্য হবে।

শংকরদা দলবল নিয়ে চলে যাবার পর তিয়াসা নিজেই নীল নিঃশব্দে গিয়ে হাজির হল। সেখানে গিয়ে অর্ককে দেখতে পেল না সে। শুভেন্দু একা বসে বসে বই পড়ছে। তিয়াসা শুভেন্দুকে অর্ক কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করল। শুভেন্দু বলল, অর্কদা এই মধুপুরেই আছে। ওই দুলেপাড়ায় সব পায়খানা-বমি শুরু হয়েছে, তাদের দেখতে গেছে। এক্ষুনি চলে আসবে। আপনি বসুন। আচ্ছা বউদি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলো না ভাই, কি কথা জিজ্ঞেস করবে?

আপনাকে দেখে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ ঠিক তাই। একটু আগে শংকরদা এসেছিল তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। তারা বলে গেছে অর্ক সেনের সঙ্গে আমাকে কোথাও যেতে দেখলে নাকি তার ফল ভালো হবে না। এরপর আর মাথা ঠিক থাকে, তুমিই বলো ভাই?

শংকরদার সাহস তো বড়ো কম নয় বউদি। আপনার বাড়ি বয়ে এসে আপনাকে এভাবে অপমান করে দিয়ে চলে গেল?

ওরাই যে বর্তমানকালের ভগবান ভাই। ওদের পুজো না করলে ওরা তো অমনি করবেই। হয়তো প্রাণেও মেরে ফেলতে ওদের এতটুকু হাত কাঁপবে না। ওদের কাছে মানুষ খুন করা ব্যাপারটা কিছুই না। সব জলভাত হয়ে গেছে। তা ভাই আমার যা হবার হোক কিন্তু তোমার অর্কদার কিছু হয়ে গেলে আমি সইতে পারব না।

আপনি চুপ করে বসুন, এত ভেঙে পড়বেন না। আমরা তো সব আছি. এত ভয় পাবার কি আছে। ওদের মতন খারাপ কাজ তো কিছু করছি না। যতটুকু পারছি মানুষের ভালো করবার চেষ্টা করছি।

ওটাইতো ওদের চক্ষুশূল। নীল নিঃশব্দ এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে ওদের রোজগারের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তাই ওরা ভয় পাচ্ছে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস তৈরি করে বশে রাখার এ এক ধরনের অপচেষ্টা বলতে পারো।

দেখুন বউদি, আমরা কোনো রাজনীতি করি না। বর্তমান দিনের কোনো রাজনৈতিক দলই দেশ ও দশের কথা ভাবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যেই তারা রাজনীতি করছে। আখেরে সাধারণ মানুষ তাদের অপকর্মের বলি হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে সাধারণ মানুষের কেমন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে. ফলে দেশের ভিতরেই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি সংগঠন। তারা ধীরে ধীরে হলেও কিছু মানুষের সমর্থন আদায় করে নিচ্ছে।

তুমি ঠিকই বলেছ শুভেন্দু। আগামী দিনগুলো মানুষের কাছে বিভীষিকা হয়ে দেখা দেবে। একটা শ্রেণির মানুষ, তারা শুধু ভোগ করে যাবে, আর বেশিরভাগ মানুষ তাদের ভোগ্য পণ্য জোগান দিতে দিতে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে। নূতন করে দেশে ক্রীতদাস প্রথা চালু হবে। যারাই এতদিন ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল তারাই নূতন করে ক্ষমতার জোরে নতুন রূপে নতুন কায়দায় নতুন ক্রীতদাসের জন্ম দেবে বা দিচ্ছে।

ক্ষমতালোভীরা ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য যত ধরনের ঘৃন্য কাজই হোক না কেন, তা তারা করতে মরিয়া। এই সব কাজের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যায়, তারা কতখানি দেশকে ভালোবাসে ও জনগণকে ভালোবাসে। যে নেতা যত বেশি ক্ষমতালোভী, তার কাছে সিংহাসনের দাম হয়ে ওঠে তত বেশি। সিংহাসন না থাকলে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম রাখতে না পারলে প্রভুত্বের অবসান ঘটার ভয় থেকে যায়। ফলে তারা শেষ অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয় সন্ত্রাস। মানুষকে ভয় দেখিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করে। অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে জেনেও ক্রীতদাসের দল চুপ করে বসে থাকে।

আর এইভাবেই গ্রামে-গঞ্জে, শহরে জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য হিটলার-মুসোলিনির দল। চারদিকে চালাচ্ছে তারা লুঠ সন্ত্রাস। সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ লুকোচ্ছে। কেউ যদি বা প্রতিবাদ করছে, তা হলে তার আর বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। তাদের উপর নেমে আসছে আক্রমণের খাঁড়া। প্রকাশ দিবালোকে জনগণের সামনে তাদের

বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া হিটলারী কায়দায় গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

দায়বদ্ধতা বলে আর কিছু নেই। হিটলার যদি বেঁচে থাকতেন, তিনিও বোধহয় ল৭ ায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতেন। মধ্যযুগীয় যে বর্বরতার কথা ইতিহাসে লেখা হয়েছে, তাও বোধহয় এই সময়কাল হার মানিয়ে দেবে। সমস্ত স্বৈরাচার, সমস্ত সন্ত্রাসবাদ, সমস্ত বর্বরতা, সমস্ত কিছুর মেলবন্ধন ঘটিয়ে নতুন কায়দায় মানুষের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। গায়ে শুধু পূজার নামাবলি।

এইরকম কথাবার্তা যখন চলছে, অর্ক সেন নীল নিঃশব্দে ঢুকল। অর্ককে আসতে দেখেই ওরা চুপ করে গেল। অর্কর সাথে যারা গিয়েছিল, তারাও কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকল। সবাই দেখল তাদের সবার বউদি তিয়াসা সমাদ্দার বসে রয়েছেন। অর্ক জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? আপনি এমন অসময়ে?

আজ একটা ঘটনা ঘটে গেছে সকালবেলা।

এমন কি ঘটনা ঘটল যে ছুটে আসতে হল?

ছুটে না এসে উপায় কি? শংকরদা তার দলবল নিয়ে এসে, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে গেছে। শুধু তাই নয় ওরা শাসিয়ে গেছে, যদি আমাদের দুজনকে বাইরে যেতে কেউ দ্যাখে তাহলে তার ফল ভালো হবে না।

ও, তাই নাকি। তাহলে আমাদের তো বেশি বেশি করে বাইরে যেতে হবে একসঙ্গে। তোমাদের এতে সায় আছে তো?

সবাই একসাথে বলে উঠল অবশ্যই। তা ছাড়া আমরা শংকরদার ক্রীতদাস নই যে তিনি যা বলবেন মাথা নত করে হুকুম তামিল করতে হবে। এতবড়ো দুঃসাহস। একজন ভদ্রমহিলাকে বাড়ি বয়ে অপমান করা। এ ব্যাপারে থানায় একটা ডায়েরি করে রাখলে হত না, শুভেন্দু বলল।

না শুভেন্দু, হত না। পুলিশ ওদের পোষা কুত্তা। ওরা যা বলবে, পুলিশ তাই করবে। বরং তাতে ওদের মনোবল আরও বাড়বে।

তুমি ঠিক বলেছ অর্কদা। তবে বেশি বেশি করে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

আমরা সতর্ক থাকলে হবে না। তোদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে। যেমন কোথাও কাজে গেলে তোদেরকে বাস স্টপেজে অপেক্ষা করতে হবে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে। আর শংকরদার উপর কড়া নজরদারি চালাতে হবে। তা হলেই ওরা চুপ করে থাকবে।

তিয়াসা বলল, আমি কি এখন বাড়ি চলে যাব অর্ক?

হ্যাঁ, তুমি এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে পারো। তবে তোমাকেও আমার বলা, একটু সাবধান সতর্ক থাকবে। বাইরের কেউ এসে ডাকলেই হুট করে দরজা খুলবে না। আর পরিকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। এবার তুমি এসো, আমাদের অন্য কাজ আছে।

তিয়াসা নীল নিঃশব্দ থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিল। তারপর শুভেন্দু অর্ককে জিজ্ঞেস করল, দুলে পাড়ায় গিয়ে কি দেখলে?

ওখানে যা দেখলাম তাতে আমার ভালো ঠেকছে না। তবে কিছু ওষুধপত্র ও হ্যালোজেন ট্যাবলেট দিয়ে এসেছি এবং সকলকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে এসেছি জলের মধ্যে কিভাবে হ্যালোজেন দিতে হবে। যেখানে সেখানে পায়খানা করা বারণ। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রোগীর পায়খানা-বমি পুঁতে ফেলা, সবরকমভাবেই আমরা বুঝিয়েছি। এর পরেও না কমলে সোজা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আর মন্টু, সনাতন তোমরা সবসময় ওই পাড়ার উপর নজর রাখবে। তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আমাকে পরে খবর দিলেও চলবে।

ঠিক আছে অর্কদা। তোমার কথামতোই কাজ হবে। তবে তুমি কিন্তু একটু সকাল সকাল চলে আসবে।

সে কথাও কি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

না ঠিক তা নয়, তবে তুমি না থাকলে মনে জোর পাই কি করে বল তো?

শুভেন্দু, তুই না সবকিছু নিয়ে বড়ো বেশি ঠাট্টা করিস। তোর স্বভাবটা একটু বদলা। তোকে হতে হবে সিরিয়াস। দুদিন পরে তুই আই. সি. এস পরীক্ষা দিবি। আর সেই তুই যদি এমন হালকা কথাবার্তা বলিস, তা হলে তোকে কেউ পুলিশ অফিসার বলে মানবে।

সত্যি অর্কদা, তুমিও বলে দিলে, আর আমিও পুলিশ অফিসার হয়ে গেলাম।

তুই কি ভাবছিস, তোর অর্কদা তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছে। নারে শুভেন্দু এ আমার তোকে নিয়ে স্বপ্ন। তুই একমাত্র ছেলে যে আমার স্বপ্নটাকে সত্যি করতে পারে। তুই মন দিয়ে পড়াশোনা কর। তোকে পুলিশ অফিসার হতেই হবে। তবুও

আমাদের চোখের সামনে ঘন অন্ধকারের মধ্যেও একটা আলোর বিন্দু তো দেখতে পাব। একজন পুলিশ অফিসারও তো অন্তত কিছু ভালো কাজ করতে পারে না কি? তুই হবি সেই পুলিশ অফিসার, যে সমাজের মধ্যে ভদ্রলোক সেজে থাকা শংকরদাদের মতো ক্রিমিনালদের শায়েস্তা করতে পারবে।

শুভেন্দু এতক্ষণ অর্কদার কথাগুলো শুনছিল, কিন্তু শুনতে শুনতে কখন যে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল সে নিজেও বুঝতে পারেনি। অর্ক তার চোখে জল দেখে বলল, দূর বোকা কাঁদতে আছে! দাদা হয়ে ছোটো ভাইয়ের কাছে এটা কি খুব বেশি চেয়ে ফেলেছি?

শুভেন্দু তাড়াতাড়ি করে অর্কর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, দাদা, তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, যাতে করে আমি তোমার স্বপ্নকে সত্যি করতে পারি। অর্ক শুভেন্দুকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, এই তো চাই। জীবনে চলার পথে নিজেকে ফাঁকি দিয়ো না কখনো, আর তা যদি দাও, তাহলে কখনোই তুমি তোমার লক্ষ্যবস্তুকে জয় করতে পারবে না। ওরে, মন্টু, সনাতন, রাখাল, তোরাও এগিয়ে যা, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত ফল পাবিই পাবি। তোদের প্রতিও রইল আমার প্রাণভরা শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।

তারপর সকলে মিলে বাড়ি চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে মন্টুরা সোজা দুলেপাড়ায় গিয়ে হাজির হল। সেখানে গিয়ে দ্যাখে অবস্থা ভালো নয়। রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। মন্টু মুহূর্ত দেরি না করে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেল দুলে পাড়ায়। সনাতন ঘুরে ঘুরে দেখে নিয়েছে, কাদেরকে এখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। মন্টু, সনাতন ও ওই পাড়ার আর কিছু ছেলে মিলে তিনজনকে তুলে দিল গাড়িতে। মন্টু নিজে ভালো গাড়ি চালায়। রোগীদের বাড়ির লোকজনকে নিয়ে রওনা দেয় মন্টু।

সনাতনও মন্টুর সঙ্গে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে মন্টু পৌঁছে দেয় মহকুমার হাসপাতাল গঙ্গাধরপুরে। সনাতন গাড়ি থেকে নেমে এমার্জেন্সিতে গিয়ে রোগীদের ভরতি করে, বাড়ির লোকেদের বুঝিয়েসুঝিয়ে আবার গাড়ি নিয়ে ফিরে যায় দুলে পাড়ায়। মন্টুরা গাড়ি থেকে নেমে দ্যাখে তাদের অর্কদাও এসে গেছে। অর্ককে দেখে ওরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অর্ক মন্টুর কাছ থেকে রোগীদের ব্যাপারে সব কিছু খোঁজখবর নিয়ে আবার তিনটি রোগীকে গাড়িতে তুলে দিতে বলল। কাকে কাকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাই ঠিক করে রেখেছিল অর্ক।

রোগীদের তোলা হয়ে গেলে মন্টু ও সনাতন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

যথাসময়ে হাসপাতালে পৌঁছেই ভরতির ব্যবস্থা করাল মন্টুরা। ইতিমধ্যে অর্ক সেন ও শুভেন্দু দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাবার জলের টিউবওয়েলে, পুকুরে ব্লিচিং দেবার ব্যবস্থা করল। প্রত্যেককে পায়খানা হলে, নুন-চিনির জল করে খেতে বলল। তারপর অর্ক শুভেন্দু নিয়ে সোজা এস. ডি. ও সাহেবের কাছে হাজির হল। উনি অর্ক সেনকে আগে থেকেই চিনতেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ক সেনের নাম শুনেছিলেন তিনি। বহু জায়গায় সমাজসেবামূলক সভাসমিতির মাধ্যমেও তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

মহকুমা শাসক অর্ক সেনকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন আজকের দিনে অর্কর মতো ছেলেদের খুব বেশি বেশি দরকার, যারা নিজেদের কথা না ভেবে শুধু মানুষের কথা ভাববে। আজকের দিনে অর্কর মতো ছেলের বড়ো অভাব। সবাই যেখানে নিজেকে ছাড়া ভাবে না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অর্ক সেন তার কাজ কেমন অনায়াসে চালিয়ে যাচ্ছে।

অর্ক সেন অফিসে ঢুকতেই এস. ডি. ও সাহেব (অমলেন্দুবিকাশ রক্ষিত) বসতে বললেন তাদের। অর্ক ও শুভেন্দু অমলেন্দুবাবুকে নমস্কার জানাল। তারপরে তারা কাজের কথা বলতে শুরু করল। অর্কই বলল, স্যার, আপনাকে আমাদের কিছু কথা বলার ছিল, আমি কি বলতে পারি?

ঠিক আছে অর্কবাবু, আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন।

দেখুন স্যার, আমরা হরিপুর থানার মধুপুর গ্রাম থেকে আসছি। আমাদের গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় আন্ত্রিক দেখা দিয়েছে। ও-পাড়ার মানুষ খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। বেশিরভাগ মানুষ দিন মজুরের কাজ করে। ওদের পাড়ায় প্রায় শ'দেড়েক পরিবার বাস করে, কিন্তু একটি মাত্র টিউবওয়েল রয়েছে। যদি আরও অন্তত খানদুয়েক টিউবওয়েল, কিছু ব্লিচিং পাউডার এবং কিছু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিতেন এবং একটা মেডিক্যাল টিম পাঠানোর ব্যবস্থাও করতেন তা হলে ওখানকার মানুষ খুব উপকৃত হতেন। এই প্রার্থনা জানাতেই আপনার কাছে আসা।

আপনারা এসে ভালোই করেছেন অর্কবাবু। আপনারা এই যে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন এর জন্য আপনাদের এবং আপনাদের নীল নিঃশব্দকে ধন্যবাদ। আমি আপনার সমস্ত কথা শুনলাম। তবে আপনারা একটা দরখাস্ত লিখে দিন। তারপর আপনি আপনার কথা অনুযায়ী বেশিরভাগই জিনিসই পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আর-একটা কথা, মেডিক্যাল টিম পাঠানোর ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখছি। সম্ভব হলে আগামীকালই আপনাদের মধুপুরে ওরা যাবে।

স্যার আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, খুঁজে পাচ্ছি না। আপনাদের মতন কিছু মানুষ এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বলে সত্যিকারের কিছু গরিব অসহায় মানুষ বেঁচেবর্তে আছে। না হলে তাদের সামনে শুধু হাহাকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না! ওদের অনেক আশীর্বাদ আপনি পাবেন।

অর্কবাবু হয়তো আমিও যেতে পারি মেডিক্যাল টিমের সাথে। আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনার ওই নীল নিঃশব্দকে দেখতে। যার ছায়ায় বসে আপনি এখনও মানুষের সেবা করবার মনের এতখানি জোর পান।

তা হলে তো খুব ভালো হয় স্যার। মধুপুরের মানুষ আপনাকে হয়তো তেমন কিছু দিতে পারবে না, কিন্তু তারা আপনাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে, আর বুকভরা ভালোবাসা জানাবে।

অর্কবাবু, আমিও একদিন গ্রামেই ছিলাম। ছেলেবেলাটা গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা করেছিলাম। বাকি জীবনটা শহরে। কিন্তু আজও আমি সময় পেলেই আমার গ্রাম হরিশপুরে যাই। সেখানকার মানুষ, তাদের কথাবার্তা, ব্যবহার আজও আমাকে মুগ্ধ করে। জানেন অর্কবাবু, আজও মেঠোপথ বেয়ে পায়ে হেঁটে আমার গ্রামে যেতে ইচ্ছে হয়। জানি না কিসের টানে কিসের মায়ায় আমি বার বার ছুটে যাই।

এই তো স্যার, গ্রামকে ভালোবাসলে, আপনার আর কিছু হবে? গ্রামের কৃষক, ফসল ফলাবে, আপনারা দর বাঁধবেন, জলের দরে তারা যাতে তাদের ফলানো ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তার সমস্ত রকম সুব্যবস্থা করে দেবেন, তা না করে গ্রামের মানুষের কথা ভাবছেন?

কেন? আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে?

না স্যার! বিশ্বাস না করে উপায় কি বলুন? আপনারও দেখছি আমার মতো মাথা খারাপ হয়েছে। গ্রামের মানুষ মরল কি বেঁচে রইল, তা নিয়ে আপনাদের কি যাবে আসবে। আপনারা কলিযুগের ভগবানদের নিয়ে মিটিং করে, ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, ওদিকে তাদের চ্যালারা সব লুটপাট করে খেয়ে নিক। ওদের মধ্যে কামড়াকামড়ি আর ছেঁড়াছেঁড়িতে যেটুকু মাটিতে পড়বে, সেটুকু দিয়ে কতটুকু আর মানুষের উপকার করা যাবে। যাক মনে কিছু করবেন না। অনেক বাজে কথা বলে ফেললাম। পারলে ছোটো ভাই মনে করে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে থাকব।

অর্করা ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে গেল। মন্টুরা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। অর্করা সমস্ত রোগীর সঙ্গে দেখা করে তাদের বাড়ির

লোকদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আজকের রাতের মতন সনাতনের থাকবার ব্যবস্থা করে মন্টু আর শুভেন্দুকে নিয়ে মধুপুরে ফিরে এল। মধুপুরে ফিরেই শুভেন্দুকে পাঠিয়ে দিল অর্ক দুলেপাড়ায়। যেখানে আন্ত্রিকে কষ্ট পাচ্ছে মানুষগুলো, তারা কেমন আছে, কি করছে, নতুন করে আবার কেউ আক্রান্ত হয়েছে কিনা, এসব জানতে। তারপর খবর পাঠানো হল তিয়াসাকে। তিনি যেমন এখনই একবার চলে আসেন নীল নিঃশব্দে।

তিয়াসা এল। তিয়াসাকে আসতে দেখেই অর্ক বলল, আপনি আগামীকাল সারাদিন নীল নিঃশব্দে হাজির থাকতে পারবেন?

তিয়াসা বলল, নিশ্চয় পারব। তবে কেন, জানতে পারি কি?

আগামীকাল মধুপুর গ্রামের দুলে পাড়ায় মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম আসবে। অতএব তাঁদের আতিথেয়তার ভার রইল আপনার উপর। হ্যাঁ খেয়াল রাখবেন, মধুপুর গ্রামের সম্মান যেন নষ্ট না হয়।

তুমি যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর দিলে, তা আমি পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবে আমায় কি কি করতে হবে সেটা জানা দরকার।

বেশি কিছু না, ওনাদের জন্যে একটা ভালো টিফিনের ব্যবস্থা থাকবে, সেগুলো আপনি প্লেটে সাজিয়ে দেবেন। আর যদি প্রয়োজন পড়ে দুপুরে ভাত খাওয়াবার তা হলে, রান্নাবান্নার কাজটাও আপনার বাড়িতে আপনাকেই করতে হবে। শুভেন্দুরা আপনাকে সাহায্য করবে। কি কোনো অসুবিধে হবে না তো?

ঠিক আছে অর্ক, তোমাকে এসব নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু সময় মতন মালপত্র এসে যেন হাজির হয় সেদিকটা খেয়াল রেখো। আর টাকাপয়সার কথা কিছু ভেবো না ওসব আমিই দেব। তুমি শুধু সময় মতো শুভেন্দুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আর কিছু বলবে?

না তিয়াসাদেবী, আর কিছু বলার নেই।

তা হলে আমি আসছি এখন?

হ্যাঁ, আপনি আসুন। মন্টু ওনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো।

তিয়াসাদেবী চলে যাবার পর শুভেন্দুরা দুলেপাড়া থেকে ফিরে এল। শুভেন্দু ফিরে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করল অর্ক, কি দেখে এলি শুভেন্দু। নতুন করে আর কেউ আক্রান্ত হয়েছে?

না অর্কদা। তবে মনে হয় রাত্রের দিকে অবস্থা কিছু পালটাতে পারে। মানুষজন

যেভাবে ভয় পেতে শুরু করেছে তাতে করে তাদের অসুস্থ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

আচ্ছা শুভেন্দু ও পাড়ায় কিছু বলিসনি তো?

কি, অর্কদা?

আরে আগামীকাল যে মেডিক্যাল টিম আসবে, সেই কথাটা।

না অর্কদা, সেকথা তো কাউকে বলা হয়নি।

তুই বাঁচালি শুভেন্দু, একথা কাউকে বলবার দরকার নেই। তবে আমাদের সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। কেন জানিস, সরকারি লোকেদের উপর আমার খুব একটা ভরসা নেই। ওঁরা না আসা পর্যন্ত কাউকে বলে লাভ নেই। শেষে লোকে হাসাহাসি করবে।

তা হবে না। কারণ এস. ডি. ও সাহেব ডায়েরিতে নোট করে নিয়েছেন. অতএব আমরা একশো ভাগই আশা রাখতে পারি।

তুই যখন এতখানি জোর দিয়ে বলছিস, তা হলে তো টিফিনটা ভোরে গিয়ে অর্ডার দিয়ে আসতে হয়। এক কাজ কর তা হলে, তুই ভোরে গিয়ে কুড়িটা টিফিনের অর্ডার দিয়ে আসবি। আর ভোলা ময়রাকেই অর্ডারটা দিস।

ঠিক আছে অর্কদা, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি ঠিক সময়মতো চলে যাব। আর-একটা কথা, অমলবাবু বলছিলেন কিছু টাকা দিলে ভালো হত।

অমল চৌধুরি (ডাক্তার), এখন চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করে গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। তবে উনি গরিব মানুষদেরও যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। তিনিই দুলেপাড়ায় আন্ত্রিক রোগীদের দেখছেন। আর অর্কর নীল নিঃশব্দেও নাম লিখিয়েছেন। তবে স্যালাইন ওষুধের টাকাটা তো দিতে হবে। তাই অর্ক শুভেন্দুকে বলল, শুভেন্দু তোকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি নিজে গিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে যা হোক একটা ব্যবস্থা করব। তবে, আগামীকাল মেডিক্যাল টিম এলে, ডাক্তারবাবুকে যেন খবর দেওয়া হয়। উনিও উপস্থিতি থাকবেন। আর নীল নিঃশব্দের মধ্যেই টিফিন খাওয়ানো হবে। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে রান্না করেও খাওয়ানো হবে। সেজন্য বাজারহাট আগে থেকেই করে রাখতে হবে। তিয়াসাদেবীর বাড়িতে রান্না হবে, তুই ওনাকে সাহায্য করবি। চল আজ আর না। এবার বাড়ি ফেরা যাক। তবে শুভেন্দু, মন্টু তোরা দুলেপাড়া হয়ে বাড়ি যাবি। ওদের সব খোঁজ-খবর নিতে ভুলিস না যেন।

একসময় সকলেই নীল নিঃশব্দকে ছেড়ে যে যার নিজের বাড়ি চলে গেল। নীল নিঃশব্দ এবার খালি পড়ে রইল একা। এবার তার শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা। সারা রাত সবাই ঘুমিয়ে পড়বে যখন, তখন সে ভাববে, তার কথা। কত নতুন নতুন মানুষ আসছে প্রতিদিন। তার ছেলেরা কিন্তু ভালোমন্দ বিচার করে তবেই না তাকে সদস্য পদ দিচ্ছে। যাকে তাকে নীল নিঃশব্দ নেবে না। সবকিছু খুব বুঝেসুঝে অর্ক সেন কাজ করছে। নীল নিঃশব্দের অর্ককে নিয়ে খুব গর্ব করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার তো কোনো কথা বলবার মতন উপায় নেই। অর্ক যা বলে তাই তার ভাষা, সে তাকে নিয়ে যা স্বপ্ন দেখে তাই তার স্বপ্ন, সে আজ মানুষের জন্যে যা কিছু করছে, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। অতএব যে কাজ মানুষের কল্যাণে সাধিত হয়, তাকে সেবাধর্ম বলা যেতে পারে। সেবাই তো মানবধর্মের মূলাধার, সেবা ছাড়া মানুষের সব কাজই বৃথা। সেজন্য অর্ক না বুঝলেও সে তো বোঝে শংকরদারা কত বড়ো শত্রু তার। ইচ্ছে থাকলেও তার তো কিছু করবার নেই। নীল নিঃশব্দ নিঃশব্দ হয়েই থেকে যাবে চিরকাল। হয়তো একদিন নীল নিঃশব্দ নীল নিঃশব্দের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে। কেউ তার খোঁজ পাবে না।

শুধু এইটুকু ভরসা, যে শংকরদারা যেমন থাকবে, অর্ক সেনেরাও বারবার ফিরে ফিরে আসবে। আর নীল নিঃশব্দ তদের মনের মণিকোঠায় ঠিক সামান্য হলেও ঠাঁই করে নেবে।

পরের দিন যথাসময়ে দুলেপাড়ায় মেডিক্যাল টিম এসেছিল। মহকুমা শাসক নিজে ছিলেন সেই টিমের নেতৃত্বে। তিনি অর্ক সেনের নীল নিঃশব্দে এসে কিছুটা সময় কাটিয়ে গেলেন। নীল নিঃশব্দ অতিথিদের যথাসাধ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিল। মাননীয় অতিথিরা নীল নিঃশব্দের কাজে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তাদের সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে যেতেও ভুল করেননি। মধুপুর গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ উপস্থিত থেকে অতিথিদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা নীল নিঃশব্দকে কতখানি বিশ্বাস করে।

তা ছাড়া এই এলাকার অমল চৌধুরি, যিনি বিভিন্ন সময় অর্ক সেনের ডাকে বিনে পয়সায় গরিব মানুষদের চিকিৎসা করে থাকেন। বর্তমানে দুলেপাড়ায় পড়ে থেকে চিকিৎসা করছেন। অতিথিরা তাঁর মুখ থেকেও শুনে গেলেন, নীল নিঃশব্দ কিভাবে আজকে মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে তিনি একটা অভিযোগও মহকুমা শাসকের কাছে রেখেছেন যে, শংকরদারা অযথা যেন অর্ক সেনের কাজে বাধা সৃষ্টি না করেন সেটা তাঁদের বুঝিয়ে দিলে, এলাকার জনগণ আপনার কাছে সকলে কৃতজ্ঞ থাকবে।

এদিকে দুলেপাড়ার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগল। হাসপাতাল থেকে সবাই ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। অমল চৌধুরি এই বুড়ো বয়সেও এখনও রোজ একবার করে নীল নিঃশব্দ ঘুরে যান। যদি তাঁকে নীল নিঃশব্দের দরকার হয়ে পড়ে! তিনি জীবনে বহু টাকা রোজগার করেছেন। কিন্তু টাকা যে কি কাজে লাগাবেন, তা তিনি এখনও স্থির করতে পারেননি। এখন তিনি মনে মনে স্বপ্ন দেখেন নীল নিঃশব্দকে জমানো টাকাগুলো দিয়ে গেলে মনে হয় ভুল কিছু হবে না।



একসময় নীল নিঃশব্দে বসে অর্ককে কথাটা বলেই ফেললেন।

অর্ক সেন ডাক্তার চৌধুরির কথা শুনে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন। তা ছাড়া আপনার রক্তজল করা টাকা। আপনি কাকে দিচ্ছেন, কেন দিচ্ছেন, ভালো করে ভেবে দেখবেন না? আর আপনি দিলেই আমরা নেব কেন? আপনার দান আমরা নিতে পারব কিনা ভেবে দেখব না। আপনার টাকা দিয়ে কি কাজ করব, সেটাও ভাববার বিষয়। তার চেয়ে এক কাজ করুন, আপনিও ভাবুন, আর আমরাও ভাবি।

নীল নিঃশব্দের কপালে এত বড়ো দাতা আসতে পারেন একটা গ্রামে, একথা ভাবতেই যেন অবাক লাগছে অর্কর। তবুও শুভেন্দুর সাথে আলোচনা করেই মনে মনে ঠিক করল যে অমল চৌধুরির দেওয়া টাকা নীল নিঃশব্দ নেবে। তবে সেই টাকা নীল নিঃশব্দের নামেই ব্যাঙ্কে জমা থাকবে। প্রয়োজনমতো সেখান থেকে তুলে নিয়ে খরচ করলেই হবে। তা ছাড়া ওই টাকাতে যখনতখন হাত দেওয়া যাবে না। এখন যেমন জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে চলছে, পরেও ঠিক তেমনি চলবে। এর কোনো হেরফের করা যাবে না।

এদিকে অমল চৌধুরিও বাড়ি ফিরে ভেবে দেখলেন, এতদিন পরে তাঁর জমানো টাকা নীল নিঃশব্দকে দিয়ে গেলে সেই টাকা কখনো নয়ছয় হবে না। সত্যিকারের ভালো কাজেই তা ব্যয় করা হবে। অর্ক আবার বলে, আগে ভালো করে ভেবে দেখুন তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। কতখানি নির্লোভ হলে তবে একথা বলতে পারে। অথচ লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে টাকা সংগ্রহ করছে। ডাক্তারবাবু আর কোনো রকম সংকোচ না করেই মনে মনে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন যে, নীল নিঃশব্দকেই

তার সমস্ত টাকা দান হিসেবে দিয়ে যাবেন। বাকি ঘরবাড়ি, জমি, বাগান, পুকুর সব নীল নিঃশব্দের নামে উইল করে দিয়ে যাবেন।

কিছুদিন কাটতে না কাটতেই শুভেন্দুর আই. পি. এস পরীক্ষার সময় এসে গেল। শুভেন্দুকে অর্ক শুধু পড়াশোনা ছাড়া কোনো কাজ করতে দেয়নি। শুভেন্দুও মন দিয়ে পড়াশোনা করেই গেছে। যথাসময়ে অর্ক সেন সঙ্গে নিয়ে গেছে শুভেন্দুকে পরীক্ষা দিতে। যতক্ষণ পরীক্ষা হয়েছে ততক্ষণই অর্ক সেন বাইরে বসে থেকেছে। ভালোয় ভালোয় শুভেন্দুর পরীক্ষা হয়ে যাবার পর আবার তারা ফিরে এসেছে মধুপুরের নীল নিঃশব্দে।

শুভেন্দু একসময় অর্ক সেনকে বলে, অর্কদা আমি যদি চাকরি পেয়ে যাই, তা হলে তোমার খুব কষ্ট হবে তাই না?

দূর বোকা ছেলে, তুই চাকরিটা পেয়ে গেলে সব থেকে বেশি খুশি বোধহয় আমি হব শুভেন্দু।

তুমি আমার কথাটা বুঝতেই পারলে না। আমি বলছি, নীল নিঃশব্দকে চালাতে গিয়ে তোমার খুব কষ্ট পেতে হবে।

ওঃ! তাই বল। সেই কষ্ট আমি সইতে পারব, কিন্তু তোর বাড়ির যা অবস্থা তাতে মনে হয় চাকরি পাওয়াটা তোর খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

কিন্তু অর্কদা, তোমাকে কে দেখবে?

কেন? বাকিরা তো আছে। তারা দেখবে।

তা হলেই হয়েছে। তোমার সবকিছু দেখভাল করা ওই যার তার কাজ নয় বুঝলে। তবে হ্যাঁ, তিয়াসা বউদি যদি দ্যাখেন, তা হলে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ফাজলামি হচ্ছে। দেব টেনে কান দুটো মলে। তখন ফাজলামি বেরিয়ে যাবে।

সত্যি অর্কদা, আমার ভাগ্যটা সত্যিই খুব ভালো। দ্যাখো, ভগবান কেমন তোমার মতন একটা দাদা জুটিয়ে দিলেন। যে শুধু ভাইয়ের শাসন করে না, ভালোও বাসে। আর সব থেকে বড়ো কথা হল কি জানো, ছেলেমেয়েদের যখন বিপথে যাবার সময়, ঠিক তখনই তোমার আগমন, তাদের কাছে দাদা হয়ে। একবার নীল নিঃশব্দে এসে পৌঁছোলে আর যাই হোক তাদের ভবিষ্যৎটা আলোয় ভরে না উঠুক, অমাবস্যার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে না।

তুই পারবি ভাই শুভেন্দু। তবে পুলিশ না হয়ে তোর সাহিত্যিক হওয়া উচিত ছিল। তুই এখন পুরোপুরি সাহিত্যিকের মতন কথা বলতে শুরু করেছিস।

বারে পুলিশে চাকরি নিলে কি সাহিত্যিক হওয়া যায় না?

কেন যায় না, তবে সে পুলিশের চাকরিতে উন্নতি করতে পারবে না।

থাক অর্কদা, ওসব বাদ দাও। গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল দিয়ে বসে থাকবার মতন ছেলে আমি নই। তাই আবার মন দিয়ে পড়াশোনা করে যেতে চাই! শুধু তুমি পাশে থাকলেই হল।

আচ্ছা একটা কাজ করে দে-না ভাই। তুই তিয়াসাদেবীর বাড়ি গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আয় দেখি তার অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি এসেছে কিনা। যদি না আসে, তা হলে আরেকবার ডি. আই. অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। আর শঙ্খকেও একটা ফোন করে জিজ্ঞেস করতে হবে।

এক্ষুনি যাচ্ছি অর্কদা! আমি যাব, আর আসব।

শুভেন্দু ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যখন সে তিয়াসাদেবীর বাড়ি পৌঁছোল তখন তিয়াসাদেবী কি যে করছিলেন। বাড়ির দরজায় টোকা দিতেই পরি এসে ভালো করে দেখল, কে এসেছে। যেই দেখেছে শুভেন্দু এসেছে, অমনি দরজাটা খুলে দিয়েই এক দৌড়ে তিয়াসাকে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে। তিয়াসা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুকে অভ্যর্থনা করে বসতে বলল, শুভেন্দুই জিজ্ঞেস করল, বউদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কি এসে গেছে?

না শুভেন্দু এখনও আসেনি। দ্যাখো না দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল। কোন খবর নেই।

এইজন্যই অর্কদা আমায় পাঠালেন, খবরটা নেবার জন্যে। তা হলে আমি এখন আসি?

তা কি করে হয় ভাই, আমার বাড়িতে এলে আর মুখে কিছু না দিয়ে চলে যাবে। এটা তো ঠিক নয় ভাই। একটু বোসো, পরি এক্ষুনি এল বলে। আচ্ছা শুভেন্দু তোমার পরীক্ষা কেমন হল?

খুব ভালো হয়েছে বউদি। মনে হচ্ছে আমার কপালে পুলিশের চাকরিই আছে।

কেন, তোমার কি পুলিশে যোগদান করতে কোনো অসুবিধে আছে?

না, বউদি না, তবে কি জানেন, আমার চিন্তা শুধু একটাই, আমি চলে গেলে আমার অর্কদাকে দেখবে কে বলতে পারেন?

কেন? তুমি কি ভাবছ, তোমার অর্কদাকে শুধু তুমিই ভালোবাসো, আমরা কেউ তাঁকে ভালোবাসি না?

তা বলছি না বউদি। তবে আমি চলে গেলে তাকে চোখে চোখে রাখবে কে? আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।

বলো শুভেন্দু, তোমার অনুরোধটা কি?

একমাত্র আপনার উপর আমার ভরসা আছে। পারলে আপনিই পারবেন এই দায়িত্ব পালন করতে।

কিন্তু লোকনিন্দের ভয় আছে তো?

আপনি লোকনিন্দের ভয় পান?

না ; তা অবশ্য পাইনে, কিন্তু সমাজ তো কাদা ছিটোতে কম করবে না। তখন তোমার অর্কদার গায়ে ফোসকা পড়বে না তো?

আপনি বলছেন একথা? না অন্য কারো কথা?

শোন ভাই, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে অর্কর কোনো ক্ষতি আমি করতে দেব না। তাতে যত বড়ো মূল্যই আমাকে দিতে হোক না কেন। মেয়ে আমার এখনো খুবই ছোটো। তবুও অর্ক সেনের জন্যে আমি নিজেকে বলি দিতে পারি। আবার অর্কর কেউ যদি কোন ক্ষতি করে তা হলে তোমরা পুলিশরা ছেড়ে দিলেও আমি তাকে ছাড়ব না এই তোমাকে বলে রাখলাম।

পরি চা-জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। তিয়াসা জলখাবারের থালাটা শুভেন্দুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল সবটুকু তোমায় খেতে হবে কিন্তু। তারপর চা খেয়ে তোমার ছুটি। শুভেন্দু খুব তাড়াহুড়ো করেই জলখাবারটা খেয়ে নিল। তারপর চা খেয়ে বউদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা নীল নিঃশব্দে ফিরে এল।

অর্ক তখনও বসেছিল একা। সবাই ফিরে গেছে বাড়ি, একটু আগে। শুভেন্দুর ফিরতে একটু দেরিই হয়েছিল। অর্ক ঠান্ডা মাথায় শুভেন্দু জিজ্ঞেস করল, কিরে কিছু খবর পেয়েছিস?

পেয়েছি অর্কদা। বউদি বললেন, অনেকদিন হয়ে গেল কোনো খোঁজ নেই, একবার খবর নিলে হত না?

সে না হয় হবে, কিন্তু এতক্ষণ ধরে কি শলাপরামর্শ করছিলে শুনি?

কি আর শলাপরামর্শ করব, এই তোমার দায়িত্বটা কার হাতে দিয়ে যাব, তাই ঠিক করছিলাম।

তা দুজনে মিলে কি ঠিক করলে?

ভাবছি, তোমার দায়িত্বটা বউদির হাতেই দিয়ে যাব। কারণ তোমাকে সামাল দেবার মতন আর কেউ নীল নিঃশব্দে নেই বলে।

এবার থেকে তা হলে তোর বউদির কথা মাঝে মধ্যে মেনে চলতে হবে বলছিস।

তা তো হবেই। তোমাকে তো আমরা ভালো করে চিনি। না দেখলে হয়তো নীল নিঃশব্দের চেয়ারে বসেই রাত্তিরটা কাটিয়ে দেবে। আর সেই সুযোগে শংকরদারা তাদের গায়ের ঝালটা মিটিয়ে নেবে।

তাহলে তোরা আমায় নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছিস দেখছি।

তা ভাবব না। আমরা না ভাবলে কে ভাববে বলো? কাকাবাবু বা কাকিমা তাঁরাও ভাববেন। কিন্তু তাঁদের ভাবনার সঙ্গে আমাদের ভাবনার কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাবে চিরকাল। তাঁরা ভাববেন, তাঁদের ছেলের, আরও অনেক বেশি করে নাম ছড়িয়ে পড়ুক, ছেলে দশজনের একজন হয়ে উঠুক। কিন্তু দ্যাখো অর্কদা, আমরা কিন্তু ওসব নিয়ে ভাবছি না। আমরা ভাবছি তোমার কেউ কোনো ক্ষতি করতে না পারুক। যদি বা কেউ কোনোরকম ক্ষতি করে দেয়, তা হলে তার বিরুদ্ধে আমরা কি ব্যবস্থা নেব, এইসব।

থাক, তোমার যে যাই ভাবো, আপাতত ওসব ভাবনা বন্ধ করে নিজেদের ভাবনা ভাবলে খুশি হব। কবে কি হবে তা নিয়ে এখন থেকে ভেবে মরছে। এসব বোকারা ভাবে। জীবনে চলার পথে অনেক ঘটনা ঘটবে, তা বলে চলার পথটা যদি হারিয়ে ফেলি, তা হলে জীবনটাই যে থেমে যাবে। তার বেলা?

শুভেন্দু একসময় চুপ করে যায়, যত কথা বাড়াবে রাতও বাড়তে থাকবে। তা ছাড়া বাড়ি ফিরতে হবে তো। শুভেন্দু অর্ককে টেনে তুলে দিয়ে বলে, চলো অর্কদা এবার বাড়ি ফেরা যাক। কথাগুলো বলতে বলতেই আজকের মতন সে নীল নিঃশব্দের দরজা তালা বন্ধ করে অর্ককে এগিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ি চলে আসে।

পরের দিন সকালবেলা অর্ক নীল নিঃশব্দে এসে দ্যাখে ডাক্তার অমল চৌধুরি বসে আছেন। অর্ক এসে বসার পর অমলবাবুই বললেন, দ্যাখো অর্ক, তুমি আমাকে ভেবে দেখতে বলেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ বলেছিলাম তো। আমি কি কিছু ভুল বলেছিলাম। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আমায় ক্ষমা করে দেবেন।

না অর্ক তুমি কোনো ভুল করোনি, ভুল করেছিলাম আমি। কারণ আমি জানি, বড়ো বড়ো অনেক সংস্থা রয়েছে, যারা এইরকম একটা টাকা পাবে জানলে আমার

পেছন ছাড়ত না। সেই জায়গায় তুমি কেমন চুপচাপ বসে রয়েছ। তোমাকে দেখে মনে হয় সত্যি তুমিই পারবে আমার টাকার সদ্‌ব্যবহার করতে। আর আমি কিনা মিছিমিছি ভাবতে গিয়ে সময় নষ্ট করলাম। আজ যদি আমার কিছু হয়ে যেত, তাহলে কি বিপদ হত বলো তো? মরেও আমি শান্তি পেতাম না।

অমন করে বলবেন না ডাক্তারবাবু। আমরা যে তা হলে অভিভাবকহীন হয়ে যাব। আপনার মতো গুণীজনেরা নীল নিঃশব্দে আসছেন বলে আমরা মনে কতখানি জোর পাই, তা আপনি জানেন না। আপনার জন্যে সদ্য দুলেপাড়ার কত মানুষ যে প্রাণে বেঁচে গেল, তা আমরা আপনাকে কি করে বোঝাব বলুন তো। শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন। তাতে বহু মানুষের উপকার হবে।

যাক ওসব কথা বাদ দাও অর্ক। কাজের কথা বলো। তোমাদের নিশ্চয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তুমি আমাকে একটু সময় দাও, আমি আমার টাকাগুলো তোমাদের নীল নিঃশব্দের নামে ট্রান্সফার বা জমা করে দিই। যা বাকি থাকবে, সব নীল নিঃশব্দের নামে উইল করে দিয়ে যেতে চাই। আমার মৃত্যুর পর তোমরা মানে নীল নিঃশব্দ সব পাবে।

ঠিক আছে ডাক্তারবাবু, চলুন কোথায় যেতে হবে। টাকা নিয়ে আপনার যখন এত দুশ্চিন্তা তখন আপনার আশাটাই পূর্ণ হোক।

নীল নিঃশব্দে শুভেন্দুকে বসিয়ে রেখে অর্ক ডাক্তারবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডাক্তার অমল চৌধুরি তাঁর বাড়ি থেকে একটা ব্যাগে করে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা অর্কর হাতে দিয়ে বললেন, অর্ক, নাও ধরো। এতে পঞ্চাশ লাখ আছে। বাকিটা ব্যাংকে আছে। অর্ক একটু বিস্মিত হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটা ডাক্তারবাবুকে বুঝতে দিল না। দুজনে নীল নিঃশব্দে ফিরে এসে অর্ক শুভেন্দুকে বলল, মন্টুকে একটু ডেকে নিয়ে আয়। শুভেন্দু মন্টুকে ডেকে নিয়ে এল। অর্ক মন্টুকে গাড়িটা বের করতে বলল। তারপর শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। ব্যাংকের সমস্ত কাজ সেরে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। অর্ক মন্টুকে বলল, যা ডাক্তারবাবুকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আয়। তুই না আসা পর্যন্ত আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করব।

মন্টু ডাক্তারবাবুকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল। অর্ক শুভেন্দু বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। দুজনেই চুপচাপ। অর্ক শুধু বলল, মন্টু, তুই গাড়িটাকে গ্যারাজ করে বাড়ি চলে যা, আমরাও বাড়ি যাচ্ছি। ওরা একসময় সবাই নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ শুভেন্দু এসে নীল নিঃশব্দ খুলে বসল। তারপর বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। প্রায় ছয়-টা নাগাদ অর্ক এল। অর্ককে দেখে সে কেমন মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। অর্ক কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে! শুভেন্দু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা অর্কদা, তোমার কি হল বলো তো? তুমি হঠাৎই এমন চুপ হয়ে গেলে কেন?

সে তুই বুঝবি না!

বারে আমি না বুঝলে, তুমি বুঝিয়ে দেবে।

আচ্ছা তুই একটু চুপ করবি?

না, চুপ করব না, তুমি আগে আমায় বুঝিয়ে বলো, তারপর আমি চুপ করব।

আচ্ছা শুভেন্দু, দু-দিন বাদে তুই পুলিশে যোগদান করবি, আর তুই কিনা এখনও ছেলেমানুষি ছাড়লি না? দ্যাখ শুভেন্দু একটু সিরিয়াস হতে চেষ্টা কর। না হলে ভবিষ্যতে তোকে পস্তাতে হবে।

তখন তুমি আমায় শাসন করবে।

সত্যি ভাই, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। সব সময় এত ভাবপ্রবণ হওয়া চলে না। বাস্তব জগৎটা বড়ো কঠিন, এত সাদামাঠা হলে বিপদে পড়বি, কি ভাবছিলাম জানিস, অমলবাবুর অতগুলো টাকা, এখন নীল নিঃশব্দের, একবারও ভেবে দেখেছিস, কেন উনি আমাদেরকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন?

অত ভেবে কি হবে? তার জন্যে তো তুমি আছো। বউদি আছেন।

তা তো আছি, কিন্তু যিনি টাকাটা দিলেন, তাঁর কথাটাও তো এবার থেকে আমাদেরই ভাবতে হবে না, কি? তার ভালোমন্দের দিকটা আমরা না ভাবলে কে ভাববে বল তো?

তুমি ঠিকই বলেছ। ডাক্তারবাবুদের সব দায়দায়িত্ব আজ থেকে নীল নিঃশব্দের। অর্কদা, উনি তো কোন আশ্রমকে এই টাকাটা দিলে, তারা ওনাদের সমস্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত। তাহলে উনি সব জেনেশুনেও কেন এ-কাজ করলেন?

ওনার ইচ্ছে, নিজের টাকায় নিজের গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করতে চান। আর করছে তাই বললেই তো আর করা যাবে না। বর্তমানে কিছু করতে যাওয়া মানে, শংকরদাদের মতো অসৎ লোকদের সাহায্য নিতে হবে। তাতে ওরা টাকাব গন্ধ পেলে ছিনেজোঁকের মতন রক্ত শুষতে শুরু করবে। মাঝখান থেকে কাজের কাজ কিছুই হবে না। টাকাগুলো জলে যাবে। তাহলে বল আমি এবার কি করি?

সত্যি তো, আমি এতটা তো ভেবে দেখিনি। ঠিক আছে অর্কদা তুমি ভেবে ঠিক করো, তারপর আমরা তো রয়েছি।

যখন কাজ শুরু হবে তখন তুই আর থাকবি না আমাদের কাছে। তখন তোর ট্রেনিং চলবে।

সত্যি অর্কদা তুমি না, আমায় নিয়ে বড্ড বেশি ঠাট্টা করো।

আমি ঠাট্টা করছি না, দেখে নিস, তোর চাকরি হচ্ছেই।

একটা সিরিয়াস আলোচনা থেকে বেরিয়ে, কি একটা আলোচনা নিয়ে পড়লে বলো তো?

কেন কথাগুলো আমার মুখ থেকে তোর শুনতে ভালো লাগছে না?

ঠিক তা বলছি না। তবে কি জানো, বাবা, মা সারাজীবন আমাদের ভাই বোনকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাই তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে বাবা, মার মুখের একটু হাসি তো দেখতে পাব, ছোটো বোনটার, একটা ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারব।

তারপর, নিজে একটা বিয়ে করব, এটা তো বললি না?

ধ্যাত, তোমার সঙ্গে আর কথা বলা চলে না। দিন দিন তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ। আবার আমাকে নিয়ে ঠাট্টা শুরু করে দিলে। আমার বিয়ের জন্যে আমার অর্কদা আছে, সবার উপর আছেন বাবা, মা।

বাবাঃ কি ছেলেরে তুই, তখন তোর আমাদের কথা মনে থাকবে?

কেন থাকবে না?

তখন আমাদের কথা ভাবতে সময়ই পাবি না। তোর বেশির ভাগ সময়টা চলে যাবে, শংকরদাদের পায়ে তেল মাখাতে। আর বাকি সময়টা, চোর বদমাশদের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে।

এখন থেকে অত ছোটো করে দিয়ো না অর্কদা। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে শুভেন্দু মুখার্জি, অর্ক সেনের ভাই। অতএব আমি তখন শংকরদাদের মতন লোকেদের কি করে জব্দ করা যায় তার কথা ভাবব।

মুখে সবাই বলে ভাই, তারপর সবাই তার নীতি আদর্শকে বস্তাবন্দি করে, আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টাকার পেছনে ছুটতে থাকে। তখন নিজের স্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে কখন যে তুই পোষা কুকুর হয়ে যাবি, তা টেরও পাবি না। যখন টাকা

আসতে শুরু করবে, তখন তুই বিক্রি হয়ে যাবি শুভেন্দু। আর যদি টাকাতে না হয়, তা হলে অজস্র লেবেল আঁটা ছেলে রয়েছে তাদের দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, তুই কোন্ রাজত্বে বাস করছিস। যখন কোনো কিছুতেই বশে আসবি না, তখন শংকরদাদের কিছু সমাজবিরোধী না হলে নিদেন পক্ষে জঙ্গি দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে।

তাহলে আমার উপায় কি হবে অর্কদা?

তা হলেও তোকে চলতে হবে, নীতি আর আদর্শের পথ ধরে, সেখানে কোন অন্যায় মেনে নেওয়া যাবে না। ওপরতলার চাপ আসবে বারবার কিন্তু মনে রাখতে হবে, তুই আইনের রক্ষক। তোর কাজ হবে, সত্যের হয়ে কাজ করা, তাতে জীবন থাকুক, বা যাক্, কিছু যায় আসে না। একটা কথা ভেবে দ্যাখ শুভেন্দু সমাজে শংকরদারা যেমন আছে আবার সেই সমাজেই আমরাও তো আছি। অতএব সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে। আর এটাই তোমাকে করে দেখাতে হবে।

আমি পারব অর্কদা, আমাকে পারতেই হবে। নিরীহ সাধরাণ মানুষগুলোকে নির্বিচারে প্রকাশ্য দিবালাকে গুলি করে মারছে। পুলিশ নীরবদর্শক মাত্র। তাদের নাকি কিছুই করবার নেই। ব্যস ওইটুকুই। ঘরে ফিরে আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এ হেন অত্যাচার শংকরদারা করবার সাহস পাচ্ছে, শুধু পুলিশের জন্যে। তা না হলে এত খুনোখুনি হত না। অনেকদিন আগেই সমস্ত লড়াই বন্ধ হয়ে যেত।

এরকম দৃঢ়তাই দরকার। দৃঢ়চেতা না হলে শংকরদাদের তোষামোদ করতে করতেই জীবনটা কেটে যাবে। জানিস তো কারো তোষামোদ করাকে আমি অপছন্দ করি। বিশেষ করে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে শুধু একটাই বলব যে, মানুষ এখন রাজনীতিকে এবং রাজনৈতিক নেতাদেরকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। এই দ্যাখ না চারদিকে শুধু জমি দখলের লড়াই চলছে। এত করে কত নিরীহ মানুষের গ্রাস যাচ্ছে, সম্পত্তি লুট হচ্ছে, মেয়েদের নির্বিচারে ধর্ষণ করা হচ্ছে এ যেন রাজ্য জয়ের নমুনা!

হ্যাঁ অর্কদা তখনকার দিনে রাজপুতানিরা ওই জন্যে জহরব্রত পালন করত। রাজা পরাজিত হলে, রাজমহিষীরা আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করত। কিন্তু আজ সময় বদলেছে তবুও অত্যাচার বদলায়নি, কোনো রাজনৈতিক দল, তারা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদের উপর শারীরিক নির্যাতন করছে অবাধে। শুধু সেখানেই থেমে নেই। আইনের রক্ষক যারা, তারা নানা কায়দায় পুরুষদের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে। আর পুলিশ, নেতারা মিলে রাতের বেলা দিব্যি আরামে একের পর এক মেয়েদের ধর্ষণ করে

যাচ্ছে। এমনটি যে স্বর্গে গেলেও পাওয়া যাবে না এটা বোধ হয় তারা ভালো করেই জানেন। গায়ে সন্ত্রাসবিরোধী নামাবলি জড়িয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গ্রামের মানুষদের ভয় দেখিয়ে পক্ষে রাখার একটা অপচেষ্টা বলতে পারো। অর্কদা রাত ক-টা বাজে, সেদিকে খেয়াল আছে? নাও, এবার উঠে পড়ো, আর এক মিনিটও দেরি করা যাবে না।

অর্ককে টেনে তুলে দিয়ে তালা হাতে শুভেন্দু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অর্ক বাধ্য হয়েই বাইরে এল। ঘরের তালা বন্ধ করে দুজনেই রাস্তায় নামল। শুভেন্দু অর্ককে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে গেল।

এরপর একদিন তিয়াসাকে সঙ্গে নিয়ে ডি. আই অফিসে গেল অর্ক। তার আগে শঙ্খকে ফোন করে সে জেনে নিয়েছিল যে, সে সমস্ত কাজ সেরে ডি. আই-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ডি. আই. কেন অযথা দেরি করছেন সেটাই দেখার বিষয়। উনি যদি এখনো না পাঠিয়ে থাকেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, তা হলে আবার শঙ্খকে ফোন করে জানাতে হবে। ওরা ডি. আই-এর কাছে হাজির হতেই, ডি. আই সাহেব তাড়াতাড়ি বসতে বললেন। তারপর বললেন ম্যাডাম আপনার চিঠি তো পাঠিয়ে দিয়েছি, আশা করছি দু-চার দিনের মধ্যেই আপনি হাতে পেয়ে যাবেন।

অর্করা নমস্কার জানিয়ে ডি. আই-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সোজা একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আবার সেই বাসে উঠে বসা। তিয়াসা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। অর্কও বিশেষ প্রয়োজন না হলে কিছু বলেনি। কিন্তু বাসে ওঠার পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। গাড়ি যখন ছাড়ল, তখন বৃষ্টির তোড় আরো বেড়ে গেল! বাসের জানালা বন্ধ করে সবাই দেখছে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে, আর বলছে, এভাবে ঘণ্টাখানেক যদি বৃষ্টি হয়, তা হলে পথঘাট সব ভেসে যাবে। বাস যে কিভাবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে সেটা ভাববার আছে। অর্ক শুনছিল সবার কথাগুলো। মনে মনে ভয় পাচ্ছিল, তিয়াসাকে নিয়ে। একা থাকলে তার এতখানি চিন্তা হত না। কিন্তু পথে কোনো বিপদ হলে, সে কি করবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে বাধা দেবার তো মানুষের সাধ্যের বাইরে। বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এতজোরে বৃষ্টি হচ্ছে যে মাঝে মাঝে বাস থামিয়ে কাপড় দিয়ে সামনের গ্লাসগুলো মুছতে হচ্ছে। এভাবে বাস চলতে থাকলে তো বাড়ি ফিরতে আবার সেই রাত হয়ে যাবে। কি আর করা যাবে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায়ও তো নেই।

তিয়াসা হঠাৎ করে বলল, কি হল বলো তো তোমার? কিছু বলছ না, অথচ তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব চিন্তিত। কি ব্যাপার?

না না, ও এমনি ভাবছিলাম এভাবে বৃষ্টি হতে থাকলে বাড়ি ফিরতে আবার রাত হয়ে যাবে। এই, আর কি।

তাই না হয় ভাবলে, কিন্তু এভাবে পাশাপাশি বসে চুপ করে থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে?

না ঠিক হচ্ছে না। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তা ভাসছে জলে, তার উপর দিয়ে অতি সন্তপর্ণে আমাদের বাসটি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। পাশের সবুজ ধানগাছগুলো হাওয়ায় দোল খাচ্ছে, আর বৃষ্টিতে ভিজছে। ওরা মনের আনন্দে যেন নৃত্য করছে! রাস্তার ধারের গাছগুলোও কেমন স্নান সেরে নিচ্ছে। আমরাই শুধু প্যাঁচপ্যোচে গরমের শিকার হচ্ছি। উপায় নেই জানালা খোলার। বাসে জল ঢুকে যাবার ভয়ে।

শ্রাবণের শেষের দিকের বৃষ্টি তো, তাই বোধ হয় এতটা বেশি হচ্ছে, এবার হয়তো বন্যা আসবে। এই সবুজ ধানের খেত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কত ঘরবাড়ি নষ্ট হবে, কত মানুষ, পশুপাখি জলের তোড়ে ভেসে যাবে। তবুও মনে হচ্ছে। আজকের দিনটা বড়ো মিষ্টি।

কেন, এতকিছুর পরেও মিষ্টি বলছ কি করে?

বারে, মিষ্টি নয়? দ্যাখো না এরকম করে পাশাপাশি বসে আবার কবে এরকম বৃষ্টিকে দেখতে পাব, কে জানে। আজ তো পেলাম এর আগের বার পেয়েছিলাম, কিন্তু সে বৃষ্টি ছিল খুব ভয়ঙ্কর কারণ বৃষ্টির থেকে ঝড় হয়েছিল বেশি। আর আজ শুধুই বৃষ্টি।

তুমি যে কবি হয়ে উঠলে দেখছি?

হব না! জীবনে এমন সুযোগ বারবার আসে না, আর এইসব টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়েই তো মানুষের বেঁচে থাকা। সব সময় শুধু খাটবে আর খাটবে। এটা তো কোনো জীবন নয়। দু চোখ ভরে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যেমন দেখব, আবার আর-একদিকে নিজের মনের সৌন্দর্যকে যেমন দেখব, আবার আর-একদিকে নিজের মনের সৌন্দর্যের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? যার মনের কোনো সৌন্দর্য নেই, সে কোনো সৌন্দর্যকেই দেখতে পায় না। তার কাছে জীবন হয়ে ওঠে একটা ধূসর মরুভূমি।

সত্যিই তোমার মনটা আজ বৃষ্টিতে ভিজে গেছে দেখছি। তুমি এখন পুরোদস্তুর একজন কবি হয়ে উঠেছ। বৃষ্টি তো মানুষকে কল্পনাপ্রবণ করে দেয়। আর সেই

কল্পনা থেকেই জন্ম নেয় কবিতা। তুমি এক কাজ করো, কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বোসো, আজ তুমি ভালো ভালো কবিতা লিখতে পারবে।

কিন্তু মশায়, যাকে নিয়ে কবিতা লিখব, তিনি যদি সবসময় মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তা হলে সেই কবিতা যে খাতার পাতায় বন্দি হয়ে রয়ে যাবে চিরটা কাল। তার চেয়ে গল্প করা যাক, বর্ষাশেষের গল্প।

না তিয়াসা জীবনের কাছে এত সহজে হার মানলে চলবে না। একটা কথা মনে রেখো, যে জিনিস খুব সহজে পাওয়া যায় তার মূল্যও ঠিক ততখানি কম, আর যে জিনিস অনেক কষ্টের মাধ্যমে পেতে হয় তার মূল্য হয় ঠিক ততখানি বেশি।

সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমার ডাকে হয়তো একদিন ভগবান সাড়া দিতে বাধ্য হবেন, কিন্তু তোমার সাড়া পাওয়া বোধ হয় এ জন্মে আমার হবে না। তবুও বলি, আমি কিন্তু তোমার জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকব, যদি কোনোদিন সাড়া পাই সেই আশায়।

তোমার ডাকে সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কোনোদিন, কারণ তা হলে অনেক তিয়াসাকে শংকরদাদের লোভের যূপকাষ্ঠে বলি হতে হবে। একজন তিয়াসার জন্য আমি লক্ষ তিয়াসার জীবনকে বরবাদ হতে দিতে পারি না।

ঠিক আছে অর্ক, তোমার কাছে কোনোদিন আমার প্রেম নিবেদন করতে আসব না। তবে আমার সমস্ত প্রেম আজকে তোমার পায়ে রাখলাম। তুমি গ্রহন না করতে পারো, ঠেলে ফেলে দিয়ো না।

বাসের মধ্যে এসব কি হচ্ছে তিয়াসা? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

না অর্ক, এখনো পাগল হইনি, তবে একদিন সত্যিই পাগল হয়ে যাব। সেদিন কিন্তু তুমি আমায় আর পাবে না।

তুমি চুপ করো তিয়াসা, এবার চুপ করে একটু বোসো। আমরা প্রায় এসে গেছি। এবার দয়া করে স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে পা রাখো। আর আঁচল দিয়ে চোখের জলটা মুছে নাও। এদিকে রাত হয়ে গেছে সে খেয়াল আছে। শুভেন্দুটা যদি না এগিয়ে আসে, তাহলে আবার শংকরদারা কি করবে কে জানে।

কি আবার করবে, বড়োজোর বদনাম দেবে, তার বেশি তো কিছু করবে না। না হয় দুজনকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে, সভা ডেকে বিচার করবে। তাতে আমার কিছু করতে পারবে না।

তোমার বদনামকে ভয় নেই?

না।

বাড়িতে তোমার একটা ছোট্ট মেয়ে রয়েছে, সেদিকে খেয়াল আছে?

সবদিকে আমার খেয়াল রয়েছে। ভুলে যাচ্ছ কেন যে, আমি নীল নিঃশব্দের একজন সৈনিক। নীল নিঃশব্দের সম্মান বাঁচাতে আমি হাসতে হাসতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

যাক আপাতত তোমাকে আর প্রাণ দিতে হবে না, চলো আমরা সামনে নেমে যাব। এবার মাথাটা একটু ঠান্ডা করো।

একটু পরেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল দুজনে, গাড়ি থেকে নেমেই দেখল শুভেন্দু দাঁড়িয়ে আছে। শুভেন্দুই জিজ্ঞেস করল, অর্কদা ওদিকে বৃষ্টি কেমন হয়েছে?

অর্ক বলল প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। গোটা রাস্তাতেই দেখছি বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। থামবার আশা তো কিছু দেখছি না। তা হ্যাঁরে সাইকেল নিয়ে এসেছিস?

না অর্কদা, মন্টু গাড়ি নিয়ে এসেছে। চলো গাড়িতে চলো। অর্করা গাড়িতে গিয়ে বসল। মন্টু গাড়ি ছাড়তেই অর্ক একটু অবাক হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মধুপুরে পৌঁছে গেল। অর্করা গাড়ি থেকে নেমে নীল নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল। সবাই বসবার পর অর্ক শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করল, তুই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলি কেন? তা ছাড়া জানিস তো নীল নিঃশব্দ কি করে চলে। মানুষ যে পয়সা আমাদের দেন, কত কষ্টের পয়সা তাদের। আর আমি তাদের পয়সা খরচ করে গাড়ি চড়ব। তাও নিজের কাজ করতে গিয়ে, এটা তুই ঠিক করিসনি ভাই।

শুভেন্দু একটি কথাও বলেনি শুধু চুপ করে শুনেছে। এবার ডাক্তার অমল চৌধুরি বললেন, আমি পাঠিয়েছি অর্ক। কারণ নীল নিঃশব্দকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তোমাদের বাঁচতে হবে। তোমরা না বাঁচলে নীল নিঃশব্দ বাঁচবে না তাই। অর্ক এবার হাসতে হাসবে বলে, একি আপনি এখনও বাড়ি যাননি? কি করে যাই বলো, তুমি বাইরে গেছ শুনলাম। তারপর তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত একটা দুশ্চিন্তা তো থাকবেই। বাড়ি চলে গেলে কি শান্তিতে ঘুমোতে পারতাম? এই যে তোমরা ফিরে এসেছ, এবার বাড়ি যাব। আর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতেও পারব।

অর্ক মন্টুকে ডেকে বলল, ডাক্তারবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। আর হ্যাঁ মাসিমাকে বলিস অর্কদার জন্যেই ডাক্তারবাবুর বাড়ি ফিরতে এতটা দেরি হয়ে গেল। তিনি যেন কিছু মনে না করেন। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মন্টু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এদিকে তিয়াসা তখনও একটা কথা বলেনি। শুভেন্দুও চুপচাপ। অর্ক শুভেন্দুকে বলল, তুই তিয়াসাদেবীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়।

শুভেন্দু মুখে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল, তিয়াসা তার পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। সেও কোনো কথা বলল না। অর্ক যেভাবে পরিবেশটাকে গরম করে দিয়েছে তাতে আর কথা বলার ইচ্ছে নেই। কারও মধ্যে থাকার কথা নয়। শুভেন্দু রাস্তায় নেমে তিয়াসাকে বলল, জানেন বউদি, অর্কদা সব ব্যাপারে বড়ো বেশি বেশি করে ফ্যালে, আরে বাবা, যা করেছি নীল নিঃশব্দের কথা ভেবেই করেছি। আর প্রয়োজন মনে করলে আবার করব। খরচটা যে দেখেশুনে করতে হবে, সেটা কি আমরা বুঝতে পারি না। আমরাও বুঝি, কিন্তু অর্কদার ব্যাপারে আমরা কোনোরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। এই আমার শেষ কথা। শংকরদারা ওত পেতে বসে আছে তার সর্বনাশ করার জন্যে আমরা তা জেনেশুনে কিভাবে ঝুঁকি নিই বলুন তো?

না ভাই, উনি যাই বলুন, তোমরা কিছু মনে কোরো না। আর ওনার কথায় রাগ কোরো না ভাই। উনি তো তুমি বলতে অজ্ঞান। শুভেন্দু মুখার্জি অর্ক সেনের প্রাণ। শুভেন্দু ছাড়া অর্ক নিষ্প্রাণ। সেটা বোধ হয় তুমিও জানো!

কথায় কথায় ওরা বাড়ির কাছে এসে গেল। শুভেন্দু বলল, বৌদি আজ আর বাড়ির ভিতরে যাব না। আপনি পরিকে ডাকুন। সে দরজা খুলে আপনাকে ভেতরে ঢোকালে তারপর ফিরে যাব। পরি এসে দরজা খুলল একসময়। তিয়াসা বাড়ির ভেতর ঢুকতেই শুভেন্দু সোজা নীল নিঃশব্দে ফিরে এল। ফিরেই দেখল অর্ক সেন একা একা বসে কি যেন গভীর চিন্তা করছে। শুভেন্দুকে ঘরে ঢুকতে দেখে অর্ক বলল, অ্যাই এদিকে আয়, কাছে এসে বোস। শুভেন্দুর মাথায় স্নেহের হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমার কথায় কিছু মনে করিস না ভাই। রাগের মাথায় কি বলতে কি বলেছি।

না অর্কদা, আমি তোমার কথায় কিছু মনে করিনি। আর তুমি যদি আমায় কয়েক ঘা মারতেও তবুও আমি কিছু মনে করতাম না। কারণ জীবনে চলার পথে তোমার কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে। তোমার মতন খুব কম মানুষ আছে যার এত টাকা দেখে মাথা ঘোরে না। যার মনের মধ্যে বিলাসিতার একটুও আঁচ লাগে না।

ওরে কার টাকা, কিসের টাকা। সেটা আগে ভেবে দ্যাখ। এ নিয়ে বিলাসিতা করবার অধিকার আমার নেই। যে জন্যে উনি দিয়েছেন সেই কাজে ব্যবহার করা ছাড়া আমি একপয়সাও নিজের আরামের জন্যে ব্যবহার করতে পারি না।

সত্যিই তুমি পারবে মানুষের জন্যে কিছু করতে। তোমার এই ত্যাগ মানুষ

বহুদিন মনে রাখবে। তুমিই পারবে আর্ত মানুষের সেবা করতে। যেখানে বহু সন্ন্যাসীও লোভের কাছে হার মেনে সাধনাকে ভুলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি সবাইকে হার মানিয়ে দিলে। যাক এসব আলোচনা পরে করলেও চলবে কিন্তু মন্টুটা এখনও আসছে না কেন! ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কি খেয়েদেয়ে আসবে নাকি বল তো?

হতে পারে, মাসিমা হয়তো নতুন কিছু রান্না করেছেন। মন্টুকে কাছে পেয়ে খুশি হয়ে না খাইয়ে ছাড়ছেন না। মন্টুটা যা পেটুক, সেও হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি।

এরই মধ্যে মন্টু গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। সে গাড়ি গ্যারাজ করে ঘরে ঢুকতেই অর্ক ঠাট্টা করে বলল, কিরে মন্টু আজ তাহলে খাওয়াদাওয়াটা ভালোই হল বল?

মন্টু একটু ইতস্ততঃ করে বলল, হ্যাঁ দাদা, আজ বেশ ভুঁড়িভোজ করলাম। শুভেন্দু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, দেখলে অর্কদা, আমরা যা ভেবেছি তাই। পেটুক কোথাকার। মন্টু একটু রাগ দেখিয়ে বলে খবরদার, আমায় পেটুক বলবে না বলে দিচ্ছি। আচ্ছা অর্কদা তুমিই বলো কেউ যদি আদরযত্ন করে খাওয়ায় তাহলে না খাওয়ার কি আছে?

ঠিকই বলেছিস। মাসিমা তা হলে খুব আদর-যত্ন করে খাইয়েছে, কিন্তু ভাই, আমাদের কথাটাও একটু ভাব। আমাদের পেটেও যে ছুঁচোয় ডন মারছে। অর্ক খুব হালকা করেই বলল। মন্টু বলল চল এবার গুছিয়ে গাছিয়ে বাড়ি ফেরা যাক। সবাই একসাথে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করল। শুভেন্দু অর্ককে রোজকার মতন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল।

দিন সাতেক পরেই শুভেন্দুর চাকরিতে যোগদান করবার চিঠি পৌঁছোল। আবার তার একদিন পরেই তিয়াসারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে পৌঁছে গেল। অর্ক সেন, ডাক্তারবাবু সবাই ভীষণ খুশি হলেন। শুভেন্দু চিঠি পেয়েই একরকম ছুটতে ছুটতে নীল নিঃশব্দে এসে হাজির হয়েছিল। তারপর এসেই অর্ককে প্রণাম করে বলল, অর্কদা তোমার কথাই ঠিক হল। আমি আই. পি. এস পরীক্ষায় পাশ করেছি। তা ছাড়া আমাকে কত তারিখে কোথায় যোগদান করতে হবে তাও ওরা জানিয়ে দিয়েছে। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৬-এর মধ্যে হাজির হতে বলেছে।

ভালোই হয়েছে শুভেন্দু। তোর প্রচেষ্টা সফল হওয়াতে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। তুই ওদের দেওয়া তারিখের মধ্যেই যোগদান করবি। এটা আমার একান্ত ইচ্ছে।

তাই হবে অর্কদা। তুমি চিন্তা কোরো না। তবে কি জানে দাদা, বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোট বোনটা, ওদের কে দেখবে বলো তো? আমি চলে গেলে ওদের একটু ওষুধ এনে দেবারও কেউ নেই।

তুই একটা সত্যিই বাঁদর। আমি আছি না। তোর বাবা, মা বোন কারো কোনো অসুবিধে হবে না। তুই মাঝে মাঝে ফোন করে খোঁজ নিস, তা হলেই বুঝতে পারবি। আর-একটা কথা, তোর রাস্তাখরচ ও হাতখরচ বাবদ টাকাটা তুই আমার কাছ থেকেই নিয়ে যাবি। দুটো প্যান্ট, দুটো জামা করিয়ে নিস। ভালো দেখে করাবি, মনে রাখিস তুই একজন আই. পি. এস অফিসার।

ঠিক আছে দাদা তাই হবে। এবার থেকে কিন্তু বউদির কথা শুনে চলার চেষ্টা করবে। বউদি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ওনাকে তুমি ভালো না বাসো, কিন্তু কষ্ট দিয়ো না। তোমার কোনো ক্ষতি হোক উনি তা সইতে পারবেন না। কথাগুলো তোমাকে বলতে বাধ্য হলাম। পারো তো ক্ষমা করে দিয়ো।

সত্যি তুই আজ আমার ভাই থেকে বন্ধু হয়ে গেলি। দ্যাখ শুভেন্দু, একথা পাঁচকান হলে তোর এই দাদার সম্মানটা থাকবে তো?

কেন থাকবে না শুনি? তুমি কি কোনো অন্যায় করেছ? ভালোবাসার মধ্যে কোনো পাপ নেই। তুমি শুধু তোমার যশ, খ্যাতির কথা ভাবছ, একবারও ভেবে দেখেছ, বউদির কি হবে। স্কুলে যোগদান করবার পর বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনে শংকরদাদের দ্বারস্থ হতে হবে। তখন কি শংকরদা চুপ করে বসে থাকবে ভেবেছ? সে সব প্রতিশোধ ওই বউদির উপর নেবে।

সে তখন দেখা যাবে। ওসব ছাড় ভাই। তোর কথা বল। এখন কেমন লাগছে? তখন তো আমাকে যা নয় তাই বলেছিলি, এবার আমি যদি বলি।

তোমার যা ইচ্ছে হয় তুমি বলো ; আজ আমি তোমার সব কথা শুধু মাথা নিচু করে শুনব।

কি আর বলব ভাই, তোর মাথার উপর অনেক বড়ো দায়িত্ব। আজ তোকেই ঠিক করতে হবে, তুই কি করবি। ভালোমন্দ বোঝার মতন বুদ্ধি তোর হয়েছে। অতএব ফালতু কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

তবে বউদির, স্কুলে যোগদান করা নিয়ে শংকরদারা প্রচুর জলঘোলা করতে পারে। তুমি কিন্তু কোনোরকম লড়াইয়ের দিকে যাবে না। তুমি সোজাসুজি আইনের পথ ধরে হাঁটবে।

আরে আগামীকালই চল না, তোর বউদিকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসি। তাহলে তুই নিজেও দেখে যেতে পারবি, কতদূর কি হল।

আজকেই বউদিকে একটা খবর দিয়ে আসতে হবে। তিনি যেন তৈরি হয়ে নীল নিঃশব্দে চলে আসেন।

ঠিক তাই। তুই তোর বউদিকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাস। কারণ শংকরদারা কতখানি ভয়ঙ্কর, তুই নিজের চোখেই দেখে আয়।

পরের দিন সত্যিই সত্যিই বেলা ১১টার সময় শুভেন্দু তিয়াসাকে নিয়ে স্কুলে যোগদান করাতে যাবে বলে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। দেখতে দেখতে তিয়াসা এসে পৌঁছোল। কিন্তু অর্ক সেনের দেখা নেই। শুভেন্দু একসময় বলল, বউদি চলুন, আমরাই চলে যাই।

তা হয় না শুভেন্দু, উনি যদি না আসেন আমি যাব না।

তা কি করে হবে বউদি? আমাকে দাদা দায়িত্ব দিয়ে গেছে। সেই দায়িত্ব যদি আমি পালন করতে ব্যর্থ হই তাহলে আমার অবস্থার কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

আচ্ছা ভাই, তুমিই বলো তো, আজ আমার জীবনের কত বড়ো দিন? সেই দিনটাতে আমি তাঁকে প্রণাম না করে চাকরিতে যোগদান করতে চলে যাব, একথা তুমি বা তিনি ভাবলেন কি করে? আমি মেয়েমানুষ বলে এতই অবহেলার পাত্রী যে আমার চাওয়া-পাওয়ার কোনোরকম মূল্য উনি আমায় দেবেন না। দেখছ তো ভাই, বেলা প্রায় বারোটা বেজে গেল উনি এখন অবধি এলেন না, এ তাঁর কি রকম আক্কেল জ্ঞান বলো দেখি?

আমার কিছু বলার নেই বউদি। দাদা সব জেনেশুনে এমন ইচ্ছে করে দেরি করছে না তো?

তা কেন হবে, কাল তো তোমরা আলোচনা করেই ঠিক করেছিলে, তা হলে আবার উনি কোথায় আটকা পড়লেন। পথে কোনো বিপদ হয়নি তো? আচ্ছা ভাই, তুমি একটিবার ঘুরে দেখে এসো না সম্ভাব্য জায়গাগুলো। আর না হলে আজ বাদ দিয়ে দাও।

ঠিক আছে বউদি, আমি একবার ঘুরে আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

কথাগুলো বলতেই বলতেই শুভেন্দু বেরিয়ে গেল, তিয়াসা এবার নীল নিঃশব্দে এবার একা। ঘরটার মধ্যে একা বসে থাকতে কেমন যেন লাগছিল। হঠাৎ দেবদূতের মতন অর্ক ঘরে ঢুকল। তিয়াসা অর্ককে দেখে মুখটা নিচু করে বসে থাকল। তারপর

অর্কর আসতে দেরি দেখে এমনিতেই অভিমানে ফুটছিল তার উপর অর্ক তিয়াসাকে একা বসে থাকতে দেখে বলল, চাকরিটা তা হলে করবার ইচ্ছে নেই? যারা নিয়ম মেনে চলতে পারে না, তারা নীল নিঃশব্দে না এলেই খুশি হব।

তিয়াসা এমনিতেই মুখ নিচু করে চোখের জল ফেলছিল, এবার অর্কর কথাগুলো শুনে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। এবার তিয়াসাকে কাঁদতে দেখে বিপদে পড়ল অর্ক। সে এখন কি করবে, কিছুই ভাবতে পারছিল না, এমন সময় শুভেন্দু ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে অর্ককে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, সত্যিই তুমি পারো অর্কদা। সেই দশটা থেকে বসে রয়েছি, তুমি এই সাড়ে বারোটায় এলে, বউদি তো তখন থেকে কেঁদেই চলেছে। তোমাকে প্রণাম না করলে উনি যাবেন না।

আমি তো এসে গেছি, তা হলে এখনো বসে বসে কাঁদার কি আছে? এবার ধুলায় গড়াগড়ি খেয়ে, আঁচলে পায়ের ধুলো পট্টি বেঁধে নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে বলো। তিয়াসা সত্যি সত্যিই অর্ককে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে শাড়ির আঁচলটা পেতে দিয়ে বলল, আঁচলে একবার পা দিয়ে দাঁড়াও। অর্ক তাই করতে বাধ্য হল, তিয়াসা অতি যত্ন করে আঁচলটা মাথায় ঢেলে দিয়ে বলল, আজ থেকে তোমার এই পায়ের ধুলোই, আমার চলার পথের পাথেয়।

শুভেন্দু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, আর ভাবছিল মানুষ যখন কেউ কাউকে সত্যিকারের ভালোবাসে তখন সমাজ-সংসার বলে তার সামনে কিছু থাকে না। থাকে শুধু অফুরন্ত ভালোবাসা যা দিয়ে আগামী জীবনে স্বপ্নের নীড় রচিত হবে। যে নীড়ে বসে তারা দুজনে জীবনের গান গাইবে। হঠাৎ করে অর্ক ঘোর কাটিয়ে বলল, আর দেরি করা কেন এবার বেরিয়ে পড়। আর পারলে তিয়াসা, তুমি আজকের এই দুর্ঘটনাকে ভুলে যেয়ো। মুহূর্তের দুর্বলতাকে মনে রাখলে জীবনে যন্ত্রণাই পাবে। সুখ কোনোদিন পাবে না।

তিয়াসা চোখের জল মুছতে মুছতে অর্ককে বলল, তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, তোমার দেওয়া সমস্ত দুঃখকে যেন জয় করতে পারে। কোনোদিন যেন তোমাকে কোনোরকম দুঃখ দিয়ে না ফেলি। অর্ক কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। শুভেন্দুও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিল। কারণ সেও জানে, বাস্তব বড়ো কঠিন। সমাজ অর্ককে নিয়ে হয়তো নানা ধরনের রসালো গল্প বানিয়ে মানুষের কাছে পরিবেশন করবে। তা ছাড়া সব থেকে বড়ো বাধা হল তিয়াসা বউদির একটা বাচ্চা মেয়ে রয়েছে, তার ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হবে।

সবাই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অর্ক বলে উঠল, কিরে শুভেন্দু, তোরা যাবি, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদবি? তিয়াসা তাড়াতাড়ি করে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে শুভেন্দুকে বলল, চলো শুভেন্দু, আর দেরি করা চলে না।

ওরা দুজনে স্কুলের পথে রওনা দিল সাইকেলে। স্কুলে পৌঁছেই হেডমাস্টার মশায়ের কাছে গেল প্রথমে। তিয়াসাকে দেখেই তিনি বললেন, আমরাও খবরটা পেয়েছি, কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। তুমি বরং একবার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করো। উনি নিজে কি বলেন দ্যাখো, তারপর না হয় এসো! তিয়াসা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিল হেডমাস্টারের ঘরে, কিন্তু কোনরকম সহযোগিতা না পেয়ে, শুভেন্দুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। শুভেন্দু তাড়াতাড়ি অর্ক সেনের বাড়ি চলে গেল। অর্ক তখনো ঘুমোচ্ছে, রঞ্জনবাবু বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। শুভেন্দুকে আসতে দেখে ঠিক বুঝেছিলেন যে কোনো খারাপ খবর আছে। তিনি শুভেন্দুকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বসালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে? শুভেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রঞ্জনবাবুকে সব কথা বললেন। রঞ্জনবাবু কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, এ-নিয়ে এতখানি চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। সরকার পক্ষ যখন স্কুলে যোগদানের চিঠি দিয়ে দিয়েছেন, তখন এ ব্যাপারে শংকরবাবুরা বেশিদিন আটকে রাখতে পারবেন না। এ ব্যাপারে ওনাদের কোনো না কোনো সমাধান করতেই হবে। এ ব্যাপারে এস. আই-র কিছু ভূমিকা আছে। উনি ইচ্ছে করলে ওনার অফিসেই যোগদান করাতে পারেন, তোমরা এ-ব্যাপারে এস. আই., বি. ডি. ও. ও এস. ডি. ও-র সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো। তারপর আবার না হয় নূতন করে কিছু ভাবা যাবে।

শুভেন্দু আধঘণ্টা বসার পরেই অর্ক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শুভেন্দুকে দেখেই কিছুটা আঁচ করতে পেয়েছিল অর্ক, তাই সে বলল, তোর বউদিকে স্কুলে জয়েন করতে দেয়নি তো?

হ্যাঁ অর্কদা।

তা হলে তো ভালোই হল, আমরাও তা হলে একবার দেখি, কি করে যোগদান করানো যায়, তোর বউদির খুব মন খারাপ করছে নাকি?

না। তা করেনি, কিন্তু লোকের কাছে তো শুনতে খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায়ও কিছু ছিল না। হেডমাস্টার তপন ঘোষ, কোনোরকম পাত্তাই দিলেন না। শুধু বললেন, সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে।

তোরা সেক্রেটারির বাড়িতে গিয়েছিলি?

না যাইনি, ভাবলাম তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর যাব।

ঠিক করেছিস তোরা। আগামীকাল সকালে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে আয়। একবার দেখে আয় তোদের মাননীয় সেক্রেটারি শংকরদা কি বলেন।

কি আর বলবে। একটা রাত তার সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি করতে হবে এই যা। তা হলেই তার পরের দিনই তিনি স্কুলে যোগদান করবার ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন। আর তা যদি না হয় তা হলে তিনি কোনোমতেই ছাড়পত্র দেবেন না।

তবুও যেতে তো হবে। না গেলে তো চলবে না। যতই হোক উনি মাননীয় সেক্রেটারি। স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব যখন ওনার হাতে জনগণ সঁপে দিয়েছেন, তখন কার কি বলার থাকতে পারে। উনিই এখন শেষ কথা বলবেন। তোমরা ওনার কাছ থেকে ঘুরে এসো আগে, তারপর না হয়, যা করার করা যাবে।

তোমার কথাই মেনে নিলাম অর্কদা। আগামীকাল আগে, দেখা তো করি।

পরের দিন যথারীতি নিয়ম মেনেই শুভেন্দু তিয়াসাকে নিয়ে প্রথমে স্কুল তারপর সেক্রেটারির বাড়িতে গেল। সেক্রেটারি শংকরদা, সব দেখে শুনে বললেন এখনতো আমাদের স্কুলে কোনো শিক্ষকের পদ খালি নেই। অতএব আমরা আমাদের স্কুলে আপাতত আপনাকে নিতে পারব না। আপনি অন্য রাস্তা দেখুন। যারা আপনাকে অ্যাপয়েটমেন্ট দিয়েছেন তাদেরকে গিয়ে বলুন, তারা সব করতে পারেন। আমাদের সরকারের এত টাকা নেই যে আপনাদের মতন ফালতু একটা মেয়েকে চাকরি দিয়ে মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাইনে গুনবে। আমাদের তো সরকারটা চালাতে হয়, অতএব ভালোমন্দটা বুঝতে হয়, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আপনারা এখন আসতে পারেন। নমস্কার!

শুভেন্দু তিয়াসাকে নিয়ে আবার ফিরে এল নীল নিঃশব্দে। অর্ক সমস্ত কথাই তাদের কাছ থেকে শুনল। তার পর শঙ্খকে একটা ফোন করল। শঙ্খ সব শুনে বলল, তোরা, এস. আই. ও এস. ডি. ও-র সঙ্গে দেখা কর। তারপর ওনারা কি উদ্যোগ নেন আগে দ্যাখ, তারপর দেখা যাবে।

সেই দিনই সঙ্গে সঙ্গে অর্ক শুভেন্দু ও তিয়াসা তিনজনে বেরিয়ে গেল এস. আই-র সঙ্গে দেখা করতে। এস. আই তাদের বললেন, স্কুল না নিলে আমার কিছুই করার নেই। আপনারা এখন আসুন।

ওখান থেকে সোজা এস. ডি. ও-র কাছে গিয়ে হাজির হল অর্করা। এস. ডি. ও সাহেব অর্ককে আসতে দেখেই বললেন, কি হল অর্কবাবু, আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ স্যার, দেখু না, এই ভদ্রমহিলার স্বামী মারা যাবার পর থেকেই ওখানকার ভগবানেরা ওনার পিছু ছাড়ছে না। এমনকী নানান কুপ্রস্তাব থেকে আরম্ভ করে একদিন সন্ধেবেলা, ধর্ষণ করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু ওনাকে বাগে আনতে না পেরে স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছেন না।

এখন আমায় কি করতে হবে?

স্যার, আমি বলব আপনাকে কি করতে হবে, আমরা এসেছি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করতে। যাতে একজন অসহায়া বিধবা মহিলা তার বৃদ্ধা শাশুড়ি ও ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে খেয়েপরে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়, তার স্কুলে যোগদান করার জন্য আপনার যতটুকু করবার আছে, ঠিক ততটুকুই করবেন, আমরা এটাই আশা করব আপনার কাছে।

বিষয়টা আপনি আমাকে একটা দরখাস্ত আকারে দিয়ে যান। আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের জেরক্স কপি। তারপর আমি সেক্রেটারি ও হেডমাস্টারকে ডেকে পাঠাব, ওনাদের সাথে কথা বলার পর যা করার আমি করছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না অর্কবাবু। দিনদুয়েক পরে এসে একবার দেখা করে খোঁজ নিয়ে যাবেন।

অর্করা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে অমলেন্দুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে হাজির হল।

সময়টা প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে, এবার বাড়ি ফেরার পালা। তিনজনেই একটা বাসে চেপে বসল। একসময় ওরা সন্ধে নাগাদ পুনরায় নীল নিঃশব্দে ফিরেই দেখে ডাক্তারবাবু বসে রয়েছেন, রঞ্জনবাবুও ছিলেন, কিন্তু তিনি সবে মাত্র বাড়ি ফিরে গেছেন। মন্টু, সনাতনরা সব, চুপচাপ বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। অর্ককে দেখে ডাক্তারবাবুই জিজ্ঞেসা করলেন, তোমরা মহকুমা শাসকের কাছে গিয়েছিলে? অর্ক বলল, হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

উনি কি কোরকম সাহায্য করবেন বলেছেন?

হ্যাঁ, ওনার সাধ্যমতো উনি চেষ্টা করবেন।

ঠিক আছে, আমি তোমার বাবার সাথে কথা বলছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে। উনি অনেক মাস্টারমশায়ের সাথে কথা বলে যেটুকু বুঝেছেন তা হল, হেডমাস্টার তপন ঘোষ, আর সেক্রেটারি শংকরদা এই কাজটা করছেন। মহকুমা শাসক যদি ওদের একটু জোর দিয়ে বলেন, তা হলে ওরা বেশিদূর এগোতে পারবেন না।

না হলে আবার শঙ্খ ব্যানার্জি ফোন করতে বলেছে। এবার যা করার সেই করবে। তারপর মিডিয়া ছাড়বে না। তখন ওরা দাঁড়াবে কোথায়, একেব্যারে ল্যাজে গোবরে হয়ে যাবে। মানুষগুলো কি শয়তান ভাবুন তো, স্কুলে ঢুকতে দেবে না। ওনাদের কি ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে, ওনারা যখন যা খুশি করবেন, অথচ কারো কিছু বলা চলবে না। এ জিনিস বেশিদিন চলতে পারে না।

চলুক না চলুক, তাতে ওদের কি যায় আসে। ওরা বহাল তবিয়তে রাজসুখ ভোগ করে যাবে চিরটা কাল এটাই মনে প্রাণে বুঝে নিয়েছে। কিন্তু এটা জানে না, কোনো না কোনো দিন জনগণ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর সেইদিন সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যাক অর্ক তুমি আবার বেশি টেনশন কোরো না। দেখবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

সবই বুঝছি, কিন্তু একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না। ওদের আমরা কি ক্ষতি করছি, যে কারণে ওরা এভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে। লোক মুখে শোনা যাচ্ছে, যে, আমিই নাকি ওদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী। জানি না, কেন বলছে ওরা? ওদের মতলব কি, তাও বুঝি না। তবে ইদানীং বুঝতে পারছি ওরা আমাকে খতম করে দিতে পারে।

আজ এখানে অনেকেই উপস্থিত আছে, কথাটা তাই বলে ফেললাম। শংকরদাদের হাত অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিনা। তারা যে কোনো কাজ অনায়াসেই করে ফেলতে পারে। তা-বলে ওদের ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। আমাদের কাজ আমাদের ঠিক করে যেতে হবে। শুভেন্দু আর দেরি করে লাভ নেই, তোর বউদিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়।

শুভেন্দু বাধ্য ছেলের মতন তিয়াসাকে বাড়ি পৌঁছোতে চলে গেল। মন্টু গেল গাড়ি করে ডাক্তারবাবুকে পৌঁছোতে। অর্ক সনাতনদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। সে ওদেরকে বলছিল যে এবার তো শুভেন্দু চাকরির জন্যে বাইরে চলে যাবে। তোরা ঠিকঠাক করে নীল নিঃশব্দটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবি তো? সনাতন বলল নিশ্চয় পারব অর্কদা। আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। তাছাড়া শুভেন্দু আই. পি. এস পরীক্ষায় পাশ করেছে। সে পুলিশ অফিসার হবে, এ তো বড়ো আনন্দের কথা। আমরা সবার কাছে গর্ব করে বলতে পারব, নীল নিঃশব্দ আমাদের শুভেন্দুকে মানুষের মতন মানুষ হতে শিখিয়েছে।

এদিকে শুভেন্দুকে একরকম জোর করেই তিয়াসা ধরে নিয়ে গেছে ভেতরে।

শুভেন্দু বসেই তিয়াসাকে বলল, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারব না বউদি, ফিরতে দেরি হলে অর্কদা আবার রাগ করবে।

ছাড় তো ভাই ওসব, দুদিন পরে, সমাজের বড়ো বড়ো ক্রিমিনালদের সঙ্গে ওঠা বসা করতে হবে। আর অর্কদার ভয়ে জুজু হয়ে যাচ্ছে। এখন থেকে এবার স্মার্ট হতে হবে, বুঝলে। ওসব ভিতু ভিতু স্বভাব বদলাতে হবে। তবে হ্যাঁ ভাই তোমার অর্কদাকে দেখো। ওর যদি কোনো বিপদ হয়, আমি তোমাকে জানাব, তুমি ভাই ছুটে এসো কিন্তু, বুঝতেই পারছ, তোমার অবর্তমানে ওর কি অবস্থা হবে। তাছাড়া এই আমার চাকরিটা নিয়েই কি যে হবে কে জানে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওই নারীলোভী শয়তানটাকে শেষ করে দিই। কিন্তু ওর জন্যে আমি কিছু করতে পারি না।

না বউদি, ওসব চিন্তা মন থেকে চিরদিনের মতন মুছে দিন, মনে রাখবেন, আপনি নীল নিঃশব্দের একজন সক্রিয় সদস্য, তা ছাড়া আমি চলে যাবার পর, আপনাকেই তো দেখতে হবে অর্কদাকে। আপনি ছাড়া আমি কারও উপর ভরসা করতে পারি না।

বউদি আজ উঠলাম। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত অর্কদা ঠিক বসে থাকবে।

শুভেন্দু তিয়াসাকে প্রণাম করে সোজা নীল নিঃশব্দে ফিরে এল। এসে সে দেখল একা অর্কদা ছাড়া সবাই চলে গেছে। অর্ক সেন একা বসে বসে কি একটা বই পড়ছে। ভেতরে ঢুকেই সে অর্ককে উদ্দেশ্য করেই বলল, আর দেরি করে লাভ নেই। রাত অনেক হয়েছে, চলো এবার বাড়ি চলো। হ্যাঁ একটা কথা তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তোমাকে বাবা-মা দুজনেই একবার যেতে বলেছেন। তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছ যে, আগামী পরশুদিন আমি চলে যাব, আর তুমি আমাকে পৌঁছোতে যাবে।

আমি একেবারে ভুলে বসেছিলাম, তুই মনে না করে দিলে তো বিপদে পড়ে যেতাম। যাক ওসব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি আগামীকাল সকালবেলা তোদের বাড়ি যাব তোদের বাড়িতে বসেই ঠিক করা যাবে সব।

দুজনে গল্প করতে করতে কখন অর্কর বাড়ির সামনে এসে গেছে, সেদিকে কারও খেয়াল ছিল না। অর্ককে পৌঁছে দিয়েই সোজা শুভেন্দু বাড়ি ফিরে গেল।

সে বাড়ি ফিরতেই তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কিরে অর্ককে আসতে বলেছিস?

শুভেন্দু বলল হ্যাঁ, অর্কদা আগামীকাল সকালেই আসবে বলেছে। ভালো করেছিস বাবা, ওকে আসতে বলে। দ্যাখ না আমরা ছেলেটাকে প্রথমে ভুল বুঝেছিলাম। ও যে এত বড়ো গুণী ছেলে তা আগে বুঝতে পারিনি। যাক এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। শুভেন্দুর বাবা কথাগুলো বলতে বলতে শুতে গেলেন।

শুভেন্দুও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু রোজকার মতন চোখে ঘুম আসতে চাইছে না। শুধুই মনে পড়ছে তার অর্কদার কথা, একটা মানুষ কিভাবে তার মনের অন্দরমহলে এতখানি জায়গা করে নিল, সে কোনোদিন এর আগে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আজ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, অর্ক সেন তার কাছে কতখানি। অর্কদার সান্নিধ্যে যারা পেয়েছে তারা ছাড়া অর্কদাকে বোঝা খুব কঠিন ব্যাপার। অর্কদা সত্যিই যদি ভালো মানুষ না হত ডাক্তার অমল চৌধুরি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চিত ধন নীল নিঃশব্দকে অকাতরে দান করে দিতেন না।

তা ছাড়া সব থেকে বড়ো ভাবনা হল, তিয়াসা বউদি আর অর্কদা। বউদি অর্কদা বলতে অজ্ঞান। তার সমস্ত ভালোবাসা, শুধু অর্কদার জন্যে। কিন্তু অর্কদা, সে হয়তো বা বউদিকে ভালোবাসে, কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই। আর এদিকে বউদি যন্ত্রণায় ছটফট করে মরছে। যদিও অন্য কেউ বিষয়টা জানে না। কিন্তু সে তো জানে, বউদির কি অবস্থা! অর্কদা বউদির ভালোবাসাকে কি করে প্রত্যাখান করছে কে জানে, বউদি সুশিক্ষিতা এবং সুন্দরী মহিলা। যাকে একটিবার পাবার জন্যে শংকরদারা লাইন ফেলে দিয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, সে বউদির ভালোবাসাকে সহজেই প্রত্যাখান করছে! এ-যেন এক আলৌকিক ব্যাপার।

এইভাবে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে প্রায় ভোর হয়ে আসছিল। কিন্তু তার ফাঁকে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। পরদিন মায়ের ডাকে তার ঘুম ভাঙল। মা ডেকে দিয়ে বলল, কিরে তুই এখনও ঘুমোচ্ছিস, আর ওদিকে অর্ক কখন থেকে এসে তোর জন্যে বসে আছে। সে তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে নিয়ে ব্রাশ হাতে করে অর্কর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অর্ক তাকে দেখে বলল রাত্রে নিশ্চয় ঘুমোতে পারিসনি?

না অর্কদা। নানা রকম ভাবনা এসে মাথায় হাজির হচ্ছে, যার জন্যে ঘুম হয়নি।

তা হলে ঘুমের আর কি দোষ বল। তা ছাড়া প্রথম প্রথম একটু ওরকম হবে, তারপর দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি আমার চাকরি নিয়ে মোটেই ভাবিনি। কিন্তু তোমাদের ভাবনা ভাবতে গিয়েই তো রাত কাবার হয়ে গেল। তোমরা দুজনে যে কি করবে, তাই নিয়েই যত

ভাবনা। তোমাদের দুজনকে ভালো দেখে যেতে পারলে তো আমার কোনো ভাবনা হত না। জানি না দাদা, আজ তোমার ভাই হয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি, বউদি তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তাঁর ভালোবাসার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। যদি পারো বউদির জন্যে তোমার মনের মাঝে একটু জায়গা করে দিয়ো। এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

শুভেন্দু, তুই এত কথা বুঝলি কি করে? তোকে কি তোর বৌদি বলেছে কিছু?

না অর্কদা। বউদিকে তুমি এতখানি বোকা ভাবলে কি করে। তিনি মরে যাবেন, তবুও কাউকে' তিনি কোনো দিন বলবেন না। কিন্তু তোমার এই ভাইটি সব বুঝতে পেরেছে। সেদিন যখন স্কুলে যাচ্ছিলাম তখন তাঁর সবকিছু দেখেছিলাম তো। তুমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা, তাছাড়া শাড়ির আঁচল পেতে পদধূলি নেওয়া, সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করা, এসব কিসের লক্ষণ অর্কদা?

তুই খুব ফাজিল হয়ে গেছিস। আজকের দিনটা তো শুধু, তারপর তুই কোথায় আর আমি কোথায়। তখন দেখব, তোর বউদির হয়ে কে ওকালতি করতে আসে।

ভুল করছ অর্কদা আমি বউদিকে তোমার সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে এসেছি। কাল থেকে তিনি তোমাকে চোখে চোখে রাখবেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে, আমায় ফোন করতে বলেছি। কি এবার বুঝতে পারছ?

বুঝতে তো সবই পারছি, কিন্তু ভেবেছি, তোরা ভেতরে ভেতরে অনেক দূর এগিয়েছিস। তবে কি জানিস ভাই, তোর বউদিকে নিয়ে, আমারও ভাবনা কিছু কম হয় না। তোর বউদি হয়তো ভাববার যতখানি সময় পায়, আমি ততখানি সময় পাই না। কিন্তু একটা কথা তো ভাবতেই হবে যে, তার ছোটো মেয়েটার কি হবে? ভবিষ্যতে সে আমাদের কি চোখে দেখবে?

ও নিয়ে ভেবো না অর্কদা। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যত বলবে। আজকের কথা ভাবলে ভবিষ্যতকে ভুলে যাবে। ধরো শংকরদারা তোমাদের দুজনকে সন্ধেবেলা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে একটা ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখল। তারপরের দিন সভা ডেকে তোমাদের বিচার করল। সেই বিচারে রায় হল, তোমাদের বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। না হলে গোটা গ্রাম তোমাদের পিঠে পোস্টার সেঁটে ঘোরানো হবে। তখন তুমি কি করবে?

ওরে শুভেন্দু, তলে তলে এতদূর ভেবেছিস? সত্যি ভাই তোরা পারিস। সে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তখন তো আর কিছু করার থাকবে না।

যাক বাবা, খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম, শংকরদাদের হাত থেকে বউদিকে সবদিকে রক্ষা করার ইচ্ছেটা তোমার আছে জেনে।

কিন্তু ভাই আমার একটা অনুরোধ আছে যে তোর কাছে।

কি অনুরোধ? বলে ফ্যালো।

হ্যাঁ, এই যে বলছি, তুই কিন্তু এই কথা তোর বউদিকে কোনোদিন বলতে পারবি না, তুই আমায় কথা দে ভাই।

তোমার কথা ভেবে, কথা দিলাম। বউদি একথা কোনোদিন জানতে পারবে না।

হ্যাঁ আরেকটা কথা, যদি শংকরদারা আমাকে খুন করে দেয়, তা হলে তুই নীল নিঃশব্দটাকে মাঝে মধ্যে দেখে যাস। আর তার সঙ্গে তোর বউদিকেও। আমি না থাকলে শংকরদারা যেন ওর কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

ঠিক আছে অর্কদা তোমার সমস্ত অনুরোধ, আমি পালন করব। মিছিমিছি ওসব নিয়ে ভেবনা তো। যখন যা হবে তা হবে। এত ভাববার কি আছে?

তুই তো বলে দিয়েই খালাস, কিন্তু আমার নীল নিঃশব্দকে বাঁচিয়ে রাখতে আজও আমি উপযুক্ত করে কাউকে গড়ে তুলতে পারলাম না। তোকে তো আমায় ছেড়ে দিতেই হল। আর-একটা শুভেন্দু না তৈরি করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না বুঝলি।

এমন সময় অনিতাদেবী সেই আগের মতই দুজনের জন্য মুড়ি কাঁচালংকা, কাঁচা পেয়াজ, শসাকুচি, আর নারকেল কুচি নিয়ে এলেন। শুভেন্দুর হাতে ব্রাশ দেখে তিনি বললেন, তুই এখনও টুথব্রাশ নিয়ে বসে আছিস? ওদিকে মুড়ি দিয়ে দিয়েছি সেদিকে খেয়াল আছে? তা ছাড়া বেলা কত হয়েছে, সেদিকটা দ্যাখ। অর্ক তুমি বাবা উঠে এসো, ও না হলে তাড়াতাড়ি করবে না। বাধ্য ছেলের মতো অর্ক উঠে গিয়ে মেঝেতে আসনে গিয়ে বসল। শুভেন্দু তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসে অর্কর পাশে এসে বসে পড়ল। ওদের মুড়ি খাওয়া শেষ হতে না হতেই দেবেন্দ্রবাবু বাড়ি ফিরলেন। অনিতাদেবী তাড়াতাড়ি ওনাকে আসতে দেখে, একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, একটু বিশ্রাম নাও আমি তোমার জন্যে শরবতের গ্লাসটা নিয়ে আসছি। আর শোন অর্ক এসেছে।

অনিতাদেবী ফিরে এসে শরবতের গ্লাসটা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে, চা গরম করতে গেলেন। ওদিকে অর্করা মুড়ি খাওয়া শেষ করে আবার দুজনে এসে নিজেদের জায়গায় বসে পড়েছে। অনিতাদেবী চা দিতে এসে শুভেন্দুকে বললেন,

তোর বাবা এসেছে। অর্ক তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দেবেনবাবুকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, মেসোমশাই আপনি কেমন আছেন এখন?

আমি এখন ভালোই আছি বাবা। তোমার বাবা, মা, কেমন আছেন, তুমি কেমন আছো? দেবেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। অর্ক বলল, আমরা সবাই ভালোই আছি!

অর্ক তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন, তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ?

না মেসোমশায় আপনি না বললে বুঝি কেমন করে বলুন?

অর্ক তো পরশুদিন যাবে পুলিশে জয়েন করতে। কিন্তু বাবা, আমার কাছে তো, এখন টাকাপয়সা নেই। তা হলে উপায় কি হবে?

ও সব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওর ভাবনা সব আমার। আপনি ওসব নিয়ে ভাববেন না। আজ সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখতে বলবেন। তারপর আমি তো ওকে পৌঁছোতে যাব। পরশু সকাল এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব।

তোমাকে যে কি বলে আশীর্বাদ করব জানি না, তবুও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোমার মঙ্গল করেন। তুমি যেন অনেক বড়ো হও। মানুষ যেন তোমার নামে জয়ধ্বনি দেয়।

আপনাদের আর্শীবাদ থাকলে, আমি আমার লক্ষে ঠিক পৌঁছোতে পারব। যত বাধাই আমার সামনে আসুক, আমি যেন অবহেলে অতিক্রম করে যেতে পারি। শুভেন্দু, ও শুভেন্দু, দুটো জামা প্যান্ট করাতে বলেছিলাম। সেগুলো এনেছিস?

শুভেন্দু হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইল, অর্কর কথার কোনো উত্তর দিল না। অর্ক তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বুঝে নিল যে জামা প্যান্ট কেনা হয়নি। ভুলটা অবশ্য তারই হয়েছে। কারণ তার বোঝা উচিত ছিল, যে সে টাকা কোথায় পাবে, সেজন্য আর অপেক্ষা না করে শুভেন্দুকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করার সময়, মৌ টিউশনি থেকে ফিরে এল। মৌ ফিরে এসেই অর্ককে দেখতে পেয়ে বলল, কি অর্কদা, আপনার ভাই যে যাবে, তার তো কিছুর তারা নেই। আপনি কেমন দাদা শুনি। যে ভাই কি করে যাবে, তার পোশাক-আশাক আছে কী নেই, সেগুলো কে দেখবে শুনি। বেশ লোক আপনি, যে ভাই অর্কদা বলতে অজ্ঞান সেই ভাইয়ের খোঁজ খবর নেবারও কি সময় হয়নি?

শুভেন্দু ধমকে বলল, মৌ, তুই চুপ করবি? অর্ক শুভেন্দুকে থামিয়ে দিয়ে বলল। মৌ, আমার ভুল হয়ে গেছে। তবে এ-ধরনের ভুল আর হবে না। আমি এখনই ওকে সঙ্গে নিয়ে জামা প্যান্ট কিনতে যাব। তারপর, টুকটাকি যা লাগবে,

সব কিনে নিয়ে আসব। তুই একটা তালিকা তৈরি করে ফ্যাল তাড়াতাড়ি। আমরা ততক্ষণ একটু কাজের কথাবার্তাগুলো সেরে নিই।

মৌ অর্কর কথা মতো লিস্ট করতে লেগে গেল। এগিকে দেবেনবাবুর সঙ্গে কিছু কাজের কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল অর্ক। অর্ক দেবেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মেসোমশাই। ও চলে গেলে আপনাদের কি কি অসুবিধে হতে পারে, একটু বলবেন?

সব কথা কি বলা সম্ভব? তবুও যেগুলো না বললেই নয়, সেগুলো বলছি শোনো। যেমন মৌয়ের টিউশনির টাকা অনেকদিন বাকি পড়ে গেছে, দেওয়া হয়নি। তারপর বাড়িতে চাল বাড়ন্ত, আমার ওষুধ কেনার পয়সা নেই। মেয়েটার একটা শাড়ি হলে ভালো হত। ছেঁড়া শাড়ি পরে ও স্কুলে যাচ্ছে। আমি বাবা হয়ে কি করে দেখি বলো তো?

এইসব নিয়েও আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি যখন আছি তখন আপনাদের কোনো কষ্ট পেতে দেব না। আমাকে যদি আপনাদের আর-একটি ছেলে ভাবতে কষ্ট না হয়।

দেবেনবাবু অনিতাদেবী অর্কর কথাগুলো শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। টপটপ করে জল গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল। অর্ক তা দেখে বলল, মেসোমশায় আমার বলা কথাতে কি আপনারা আঘাত পেলেন?

দেবেনবাবু বললেন, না বাবা, না, তোমাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। মানুষ যে বলে অর্কর মতন ছেলে হয়না, আজ বুঝলাম, তারা কেন বলে। তোমার মতন ছেলে কেন ঘরে ঘরে জন্ম নিল না। তাহলে তো আমাদের মতন গরিবদের কোনো কষ্টই থাকত না। সেই কথা ভাবতে গিয়েই আনন্দে চোখের জল বাধা মানল না। এই আর কী।

অর্ক ডাক দিল, অ্যাই মৌ, তোর হয়েছে? কতক্ষণ লাগে একটা লিস্ট তৈরি করতে জানিনে বাপু, তা হলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সংসার চালাবি কি করে?

হয়ে গেছে অর্কদা। একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

অর্ক জোর দিয়েই বলল, তোকে আর চোখ বুলাতে হবে না। তুই যে অবস্থায় আছিস, বেরিয়ে আয় বলছি, এত দেরি হয়ে গেলে চলবে কেন?

মৌ তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। লিস্টটা অর্কর হাতে দিয়ে বলল, নিন আপনার ফর্দ, আমি এবার চললাম, আমায় স্কুল যেতে হবে। অর্ক

বলল, কোথায় যাচ্ছিস, এক্ষুনি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তোকে। আমরা সবকিছু মনে করে কিনতে পারব না। তুই সঙ্গে গেলে আমরা একটু সাহস পাব বুঝলি?

তিনজনেই বেরিয়ে পড়ল। শুভেন্দু মৌকে সাইকেলের পেছনে বসতে বলল। তারপর ওরা নীল নিঃশব্দ হয়ে কাশীপুর বাজারে এসে পৌঁছোল। তারপর ওরা একটা পরিচিত কাপড় দোকানে উঠল। প্রথমে শুভেন্দুর জন্যে জামা প্যান্ট, মৌয়ের জন্য এক জোড়া শাড়ি, তারপর গামছা তোয়ালে, পাজামা, পাঞ্জাবি, সব কেনা হলে, ওগুলো প্যাকেট করতে বলে, জুতোর দোকানে উঠল। ভালো শু বেছে দিল শুভেন্দুকে। শুভেন্দু মাপটা দেখে নিল। তারপর টুথপেস্ট, সাবান, ক্রিম, রেজার, ব্লেড সব কিনে সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে ফিরে এল নীল নিঃশব্দে। যখন ওরা ফিরল, তখন তিয়াসা এসে বসেছিল। শুভেন্দু মৌকে বলল ইনিই আমার তিয়াসা বউদি। যার কথা তোদের অনেকবার বলেছি।

মৌ সোজা গিয়ে তিয়াসাকে প্রণাম করল। তিয়াসা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে, তোমার নাম কি? আমার নাম মৌপ্রিয়া মুখার্জি, শুভেন্দু মুখার্জি আমার দাদা, কি এবার হয়েছে তো বউদি! দাদার কাছে আপনার প্রশংসা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আজ আপনাকে চোখে দেখে আমার চক্ষু-কর্ণ, দুই-ই সার্থক হল।

বাব্বাঃ, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো তো দেখছি। তা এবছর কোন্ ক্লাস হচ্ছে।

এবছর আমি হারায় সেকেন্ডারি দেব।

ভালো করে পড়াশোনা করছ তো? ভালো রেজাল্ট করতে হবে কিন্তু। না-হলে ভীষণ রাগ করব। তুমি শুভেন্দু মুখার্জির বোন, সঙ্গে অর্ক সেনেরও।

ও, আপনার নয় কেন?

সরি, ভুল হয়ে গেছে, তুমি কিছু মনে কোরো না কিন্তু।

না, না, কিছু মনে করিনি, শুধু ঠাট্টা করলাম।

বেশ বুদ্ধিমতী বলে তো মনে হচ্ছে।

বুদ্ধিমতী না ছাই।

না মৌ। নিজেকে অতখানি ছোটো ভাবতে নেই। বুদ্ধি সবার মধ্যেই রয়েছে। কেউ তা প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়, কেউ পায় না। তুমিতো তাদের দলে পড়ো না।

কেন বউদি? আমরা তো বড়ো গরিব। টাকার অভাবে এবার হয়তো পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হবে।

টাকার অভাবে তোমায় পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হবে, কে বলেছে? নাকি নিজে নিজেই ভেবে মরছ? তোমার শুভেন্দুদা এখন হয়তো টাকা দিতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু তোমার অর্কদা রয়েছে আমি রয়েছি। তারপরেও তোমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে ভাবলে কি করে?

বউদি। দাদার কাছে আপনার অনেক গুণের কথা শুনেছি, আমি আজ নিজেই প্রত্যক্ষ করলাম। সত্যিই আপনি কি ভালো।

আচ্ছা মৌ, তোমরা যে ব্যাগে করে কিসব আনলে, আমাকে দেখালে না তো?

আপনি দেখবেন বউদি? তা হলে এই দেখুন, দাদার প্যান্ট জামা, আমার শাড়ি, ব্লাউজ, শায়া।

তিয়াসা খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। একটা একটা করে দেখে, ব্যাগে ভরে রাখতে লাগল। দেখা শেষ হলে মৌকে জিজ্ঞেস করল, তা হ্যাঁরে শাড়িগুলো তোর পছন্দ, না তোর অর্কদার?

না, কিছুই আমরা পছন্দ করিনি, অর্কদা যা পছন্দ করে দিয়েছেন, আমরা তাই নিয়েছি। কিন্তু সবই আমাদের পছন্দ হয়েছে।

তা হলে তো তোর অর্কদার পছন্দের তারিফ করতেই হয়, সত্যি মৌ সব জিনিসগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে।?

জানেন বউদি, এগুলো কেনবার জন্যে যা টাকা লেগেছে, সব টাকা অর্ক-দা দিয়েছেন! অর্কদা সকালবেলাই আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন, আমি টিউশনি থেকে ফিরতেই আমাকে ধরে নিয়ে গেছলেন বাজারে, জানেন বউদি, দাদা যে আগামী কাল যাবে, তার জন্যে যা টাকা লাগবে তাও অর্কদাই দিচ্ছেন। আর দাদাকে পৌঁছোতেও যাবেন অর্কদা নিজে।

তবে যে টাকার জন্যে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে বলছিলি। তোর অর্কদার কতটুকু জেনেছিস, যত দিন যাবে, তত বেশি বেশি চিনতে পারবি। আর তখন দেখবি, যে, অর্কদা, তোর শুভেন্দুদার থেকে কোনো অংশে কম যান না।

এখনই বেশ বুঝতে পারছি বউদি।

এদিকে বেলা বাড়ছিল। এখনো গোছগাছ সব বাকি। অর্ক এক সময় বলল নারে শুভেন্দু বাড়ি ফিরে যা, খেয়েদেয়ে সব গুছিয়ে নিস। আমি পারলে বাড়ি ফেরার সময় তোদের বাড়ি হয়ে যাব। নে-নে উঠে পর। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

শুভেন্দু উঠে গিয়ে তিয়াসাকে প্রণাম করে বলল, বউদি সকালে হয়তো দেখা

হবে না, তাই আজকেই প্রণামটা সেরে ফেললাম। আপনি আমায় আর্শীবাদ করুন। আমি যেন আমার কাজে সফল হতে পারি।

তিয়াসা মাথায় হাত রেখে বলল, জয়তু ভবঃ। মৌ শুনে হেসে ফেলল। সে বলল বউদি যাবার বেলায়ও আপনি হাসিয়ে ছাড়লেন? তিয়াসাও হাসতে হাসতে বলল, ওরে পাগলি, শুভ কাজে যাবার সময় কান্নাটান্না ভাল লাগে না। তা ছাড়া শুভেন্দু আমাদের সবার মুখ উজ্জ্বল করবে, দেখে নিস তুই। তাই একটু গরম পরিবেশটাকে হালকা করে দিলাম বুঝলি? এবার শুভেন্দুকে একটু বসতে বলে তিয়াসা ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। বাড়িতে এসে হাজারখানেক টাকা নিয়ে আবার তক্ষুনি ফিরে এল। টাকাগুলো শুভেন্দুর পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, এটা তোর দিদির উপহার। আজ থেকে তুই আমায় বউদি বলে ডাকবি না, শুধু দিদি বলে ডাকবি, বুঝলি। এবার সত্যি সত্যিই মৌ কেঁদে ফেলল, তিয়াসার চোখও আর্দ্র না হয়ে গেল না। তিয়াসা চোখ মুছতে মুছতে বলল, একদিন তোর দিদি, তোদের সবাইকে কাঁদিয়ে দেবে। আজ যেমন তোর জন্যে তোর দিদি কাঁদছে। তোরাও একদিন এই হতভাগি দিদির জন্যে কাঁদবি।

সত্যিই এবার পরিবেশটা কেমন যেন দুঃখে ভরে উঠল, মমতার এক অটুট বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল সবাই। শুভেন্দুরা এক সময় চলে গেল, নীল নিঃশব্দে এখন শুধু অর্ক সেন আর তিয়াসা সমাদ্দার। দুজনেই ইতস্তত করছিল, কে আগে কথা বলবে। একসময় অর্কই জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তুমি কি টাকা দেবার আর সময় পেলে না?

কেন, এমন দুর্দিনে দেব না তো কি, সুখের সময় দেব?

সেকথা আমি বলিনি, আমি বলছি, তুমি তো লুকিয়ে শুভেন্দুকে দিতে পারতে।

কেন, এতে লুকিয়ে দেবার কি আছে? দিদি তার ভাইকে অসময়ে সাহায্যে করছে, এতে লুকোচুরির কথা আসছে কোথা থেকে, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

তোমার মাথায় এখন কিছু ঢুকবে না! তুমি তো ওকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়েদাইয়ে তারপর টাকাটা দিলে কেমন হত বল তো?

তুমি ঠিকই বলেছ! তা হলে একটা কাজ করে দাও না আমার! তুমি চট করে একবার সাইকেলটা নিয়ে, ওদের বাড়িতে বলে এসো না, দুপুরে শুভেন্দু আর মৌ যেন আমাদের বাড়িতে খেয়ে যায়।

কি ফ্যাসাদে ফেললে বলো তো? মাথায় তো গোবর ছাড়া কিছুই নেই।

অ্যাই ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

ঠিক আছে, তুমি গিয়ে এখন রান্না করোগে যাও। আমি না হয় নেমতন্নটা করে আসি। আচ্ছা, ওরাই যাবে না আমিও যাব।

—ছিঃ ছিঃ, দ্যাখো, তোমাকেও বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। তুমিও এসো কিন্তু। আর যদি আজ না আসো, তা হলে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিলাম। ভয় নেই, শংকরদারা যা করবার, তারা তা করবেই। তুমি আমার বাড়ি গেলে কি, না গেলে, তারা ছাড়বে না!

অর্ক চলে গেল শুভেন্দুদের বাড়ি, আর তিয়াসা গেল তার বাড়ি। অর্ক শুভেন্দুর বাড়ি পৌঁছোতেই, মৌ বলল, কি হল আপনি হঠাৎ চলে এলেন? অর্ক কোনরকম ভনিতা না করেই বলল, আজ দুপুরে তিয়াসা বউদির বাড়িতে তোর এবং তোর দাদার নেমতন্ন, উনি ভুলে গেছলেন, তাই আমাকে পাঠালেন। তোরা যাবি তো? কেন যাব না অর্কদা। তুমি এসেছ নেমতন্ন করতে, এ তো রীতিমত ভাববার ব্যপার। কি অর্কদা কিছু গন্ডগোল নেই তো?

খুব ফাজিল হয়েছিস দেখছি। দ্যাখ মৌ, বাড়িতে মাসিমা মেসোমশায় আছেন, ওনারা শুনলে, কি ভাববেন বল তো? বাড়িতে এ ধরনের ফাজলামি করিস না।

ঠিক আছে অর্কদা, এই নাক-কান মলছি, আর ভুল হবে না। দেখে নেবেন।

তোরা ভাই বোন, দুটোতেই সমান। তোদের মধ্যে সব ভালো গুণগুলোই রয়েছে। তোদের এই সহজ সরল জীবন আমাকে খুব টানে। তোরা সেইজন্যে এতখানি অর্থনৈতিক অভাবেও নিজেদের মনোবল হারাসনি।

আমরা তো গরিব, তাই হয়তো এরকম হয়। যারা বড়োলোক, যাদের অনেক টাকাপয়সা রয়েছে তারা তো বেশির ভাগই সহজ সরল হতে পারে না, এই যে আমার ক্লাসের বন্ধুরা অনেকেই আমাকে হিংসে করে, কিন্তু আমি গরিব বলে সবাই কেমন এড়িয়ে যায়। যদিও আমি তাতে কিছু মনে করি না।

তাদের ব্যবহার নিয়ে চিন্তা করলে তো তোর পড়াশোনার ক্ষতি হয়ে যেত। তার চেয়ে কোন কিছুকে পাত্তা না দিয়ে, ভালোভাবে পড়াশোনা করে ভালো ফল করলে, দেখবি, ওরা তখন নিজেরাই তোর সাথে আলাপ করতে আসবে। আর সেটিই হবে তোর উপযুক্ত জবাব দেওয়া।

শুভেন্দু ডাক্তার অমলবাবুর সাথে দেখা করতে গেছল। সে সেখান থেকে ফিরে

এসেই দেখে অর্ক, আর মৌ দুজনে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। সে অর্ককে দেখে বলল, কি ব্যপার তুমি এমন অসময়ে?

বারে, কেন্ন আসতে নেই বুঝি।

না, কেন আসবে না, তুমি যখন খুশি আসতে পারো। তোমার আসাযাওয়া নিয়ে, কোনোরকম জিজ্ঞাসা থাকতে পারে না। তবুও বলছি কি ব্যাপার বলো তো?

তুই এখন স্নান সেরে আয়, তারপর বলছি, কী ব্যাপার। অ্যাই মৌ, তুইও তাড়াতাড়ি স্থানের পর্বটা চুকিয়ে নে। না হলে আবার দেরি হয়ে যাবে।

আর কোনোরকম প্রশ্ন না করেই স্নান করতে চলে গেলই দুজনে। সেই ফাঁকে অনিতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্নান করবে না অর্ক? না, মাসিমা। আমি ভোরে উঠে স্নান করে নিই, অর্ক বলল।

তুমি আমাদের জন্যে যা করছ, তা আমরা কোনোদিন ভুলব না বাবা। জানি-না তোমার এ ঋণ আমরা শোধ করব কি করে। দিন দিন তোমার কাছে আমাদের বোঝা তো বাড়তেই থাকবে।

একী বলছেন মাসিমা, আমি যদি আপনাদের আর-একটা ছেলে হতাম, তা হলে কি বলতে পারতেন এই কথাগুলো? আসলে আপনারা এখনো আমাকে নিজের করে নিতে পারেননি। শুভেন্দু যেমন আপনাদের ছেলে, আমিও আপনাদের আর-এক ছেলে মনে করুন না, তা হলে দেখবেন, আর এ কথাগুলো মনে আসবে না।

তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। তোমার মতন উদার মন পেলাম কোথায়?

উদারতা মানুষকে কতখানি মহৎ করে, আপনাকে কী করে বোঝাব। আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে একেবারে ভাববেন না। আমি যা করছি তা কেবল আমার জন্যে করছি। আপনাদের জন্যে কিছু করছি না। এগুলো আমার কর্তব্য মনে করেছি, তাই করছি।

সত্যি অর্ক। তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করে তিনি রত্নগর্ভা, এমন ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন তিনি সত্যিই ভাগ্যবতী।

এমন সময় শুভেন্দুরা ভাই বোনে স্নান সেরে ফিরে এল। অর্ক বলল, মৌ, তুই আজ নতুন শাড়ি পরে যাবি, সঙ্গে শুভেন্দুও নে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়, আর তোরা দেরি কররিস না ভাই, একটু আগে যেতে পারলে মৌ, রান্নার কাজে খানিকটা সাহায্য করতে পারবে।

ওরা সত্যিই বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। তিনজন মিলে সাইকেলে চড়ে পৌঁছে

গেল তিয়াসাদের বাড়ি। পৌঁছে দরজায় টোকা মারতেই পরি এসে দরজা খুলে দিয়ে অর্কদের বসার ঘরে নিয়ে বসতে দিল। মৌ, পরিকে জিজ্ঞেস করল তার দিদিমণি কোথায়। পরি তাকে সঙ্গে করে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। মৌ গিয়েই তিয়াসাকে, তার শাশুড়িমাকে ও পরিকে প্রণাম করল। পরি বলল হায় দিদিমণি, এ-তুমি কি করলে? বামুনের মেয়ে হয়ে, ছোটো জাতের মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে? আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না। মৌ উত্তরে বলল, তুমি জাতপাত নিয়ে ধুয়ে জল খাও, আমি ওসব মানি না। বড়োরা সকলেই গুরুজন তুমি আমার থেকে বয়সে বড়ো, তাই তোমায় প্রণাম করেছি। তা ছাড়া তোমাদের ভগবান যদি সবার মধ্যেই থাকেন, তা হলে এসব নিয়ে এত ভাববার কি আছে। আমার মধ্যে যিনি আছেন তোমার মধ্যেও তিনিই যদি থাকেন, তা হলে আমার ভুলটা কোথায় বলো দেখি।

তিয়াসা এবার বলল নাও ঢের হয়েছে। এসব নিয়ে আর তর্ক করতে হবে না। যা হয়েছে ঠিক হয়েছে। মৌ, তুই একটা কাজ কর, সব রান্নাই হয়ে গেছে। এবার শুধু চাটনিটা বাকি আছে। তুই ওটা কর। আমি দেখি গিয়ে ওরা কি করছে, তিয়াসা সোজা বসার ঘরে গিয়ে দ্যাখে অর্ক, শুভেন্দু বসে বসে গল্প করছে। সে ঘরে ঢুকতেই সব চুপ হয়ে গেল। সে ঘরে ঢুকেই বলল কি এমন গল্প হচ্ছিল শুভেন্দু যে আমি আসতেই সব বন্ধ হয়ে গেল? শুভেন্দু বলল, তোমায় নিয়েই গল্প হচ্ছিল। তুমি অর্কদাকে পঠিয়ে কিভাবে আমাদের ডেকে নিয়ে এলে, এইসব আর কি?

ঠিক আছে তোকে আর ওনার হয়ে ওকালতি করতে হবে না। তুই তো ভাই এবার চাকরি করবি। আর আমি চাকরি পেয়েও পাই না। যতদিন না যোগদান করতে পারি, ততদিন আমার যে কি হবে কে জানে। এখন তো তোর অর্কদার উপরেই নির্ভর করছে, আমি যোগদান করতে পারব কি পারব না। দিন যত পেরিয়ে যাচ্ছে, আমার দুশ্চিন্তাও তত বাড়ছে।

অর্ক এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিল। এবার সে বলল, শংকরদারা যে আমার উপর হিংসে করে তোমার উপর প্রতিশোধ নেবে, সেটা ভাবি কি করে বলো তো? তবুও আমাকে তো আমার কাজ করে যেতে হবে। ঘরে বসে বসে শুধু ভেবে মরলে তো চলবে না। শুভেন্দু তোর দিদির চাকরিটা নিয়ে সত্যিই খুব ভয় পাচ্ছি। তবে হ্যাঁ জনমত কিন্তু তোর দিদির পক্ষে। বিকাশ ভবনের শঙ্খ ব্যানার্জি থেকে শুরু করে, ডি. আই., এস. ডি. ও., এস.আই, তার সঙ্গে জনগণ, সব মিলিয়ে ভালোই বলা যায়। শুধু সেক্রেটারি শংকরদা, আর হেডমাস্টার, ওরা দুজনে যা বিরোধিতা করছে। শেষ পর্যন্ত

আশা করছি ওরা পরাস্ত হবে। আমি ভাবছি, কিন্তু, তারপর তো নানান বিষয়ে ওদের কাছে যেতে হবে, তখন যদি কিছু করে বসে, তা হলে কি হবে।

এমতাবস্থায় মৌ এসে বলল, বউদি হয়ে গেছে। এবার আসন পেতে শুধু খেতে দেবার পালা। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। দুপুর যে গড়িয়ে গেল। অর্কদার খুব কষ্ট হবে। তাই না বউদি?

অর্ক বলল শুধু আমারই কষ্ট হবে, তোর হবে না মুখপুড়ি, তুই তো সকাল থেকে কিছুই খাসনি। আমরা তো তবু মুড়ি খেয়েছিলাম। তিয়াসা বলল, দেখছ মেয়ের কাণ্ড। তিয়াসা তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরি এতক্ষণ মেঝেতে আসন পেতে অপেক্ষা করছিল। তিয়াসা ভাত বেড়ে সাজিয়ে দিল, মৌ, ভাতের থালাগুলো ধরে দিয়ে অর্কদের ডেকে নিয়ে এল। অর্ক খেতে বসে বলল, কি ব্যাপার, এ-যে একেবারে বিয়েবাড়ির খাওয়া মনে হচ্ছে, এত সব রান্না এত কম সময়ের মধ্যে হল কি করে? তিয়াসা উত্তর দিল, না মশায় বিয়েবাড়ি টিয়েবাড়ি নয়, আজ আমাদের অরন্ধন, তাই এতসব রান্না হয়েছে। তোমাদের তো কোনোদিন ডেকে খাওয়াতে পারিনি, আজ শুভেন্দুর জন্যে আমার সব আশা ঠাকুর পূর্ণ করে দিলেন। যা হোক নিজের হাতে এতসব রান্না করে তোমাদের খাওয়াতে পারছি, এটা আমার সৌভাগ্য বলতে পারো। শুভেন্দু খেতে খেতে বলল জানো দিদি তোমার হাতের রান্না তো এই প্রথম খেলাম, সত্যিই তুমি খুব ভালো করেছ। অর্কদাও মনে হয় এই প্রথম খেলে, তাই তো? না হয়তো দিদি কোনোদিন লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াতেও পারে।

অর্ক এতক্ষণ চুপচাপ খাচ্ছিল। এবার সে মুখ খুলল, তোরা ভাই বোন মিলে আমায় কি পেয়েছিস বল তো? জানিস কী, তোর দিদি আমাকে নেমতন্নই করেনি। তোদের নেমতন্ন করে ডেকে আনতে বলেছিল, আমি বিনা নেমতন্নে খেতে এসেছি! এবার তুই-ই বল আমি কি ভুল করেছি?

শুভেন্দু বলল, না অর্কদা। তুমি ভুল করতেই পারো না। দিদিই ভুল করেছে, তোমাকে নেমতন্ন না করে। কিগো দিদি, তুমি অর্কদাকে নেমতন্ন করোনি? তিয়াসা হাসতে হাসতে বলল, ওনাকে কেন নেমতন্ন করতে হবে শুনি। আপনার লোককে কেউ বুঝি নেমতন্ন করে? থাক আমি তো জানতাম না, যে উনি নিজের লোক নন, তাই ভুল হয়ে গেছে ভাই।

সবাই হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। মৌ সব শুনে বলল, কেমন এবার জব্দ হয়েছেন তো? এবার কি বলবেন, বলুন।

চুপ করে গেল অর্ক। খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে বসার ঘরে গিয়ে বসল।

এবার তিয়াসা শাশুড়িমা অঘোরময়ীকে খাইয়ে নিজেরা খেতে বসল। মৌ খেতে খেতে হাসছিল শুধু। তিয়াসা জিজ্ঞেস করল কিরে মৌ, তুই এত হাসছিস যে। মৌ হাসতেই হাসতেই বলল, জানেন বউদি, বিদ্যাসাগরমশায় বিধবা বিবাহ, ভাগ্যিস চালু করে গেছলেন। না হলে তো বিরাট সমস্যায় পড়তে হত।

ওরে দুষ্টু মেয়ে এতদূর। ঠিক আছে দাঁড়া, তোর বিয়ের সময় দেখব। আমার কথাটা ঠিক মনে থাকবে। তখন তোকেও এমন দেব না বুঝতে পারবি, হাড়ে হাড়ে। এখন আর ফাজলামি না করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, তোর দাদারা আবার তাড়া লাগাবে। দেখিস তোর অর্কদাকে বলে একটা ভালো ছেলে দেখে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেব।

তা তুমি পারো বউদি, অর্কদাকে তুমি যা বলবে, তোমার কোনো কথাতেই তিনি না বলতে পারবেন না। তবে আগে তো হায়ার সেকেন্ডারিটা পাশ করতে দাও, তারপর না হয়, যা ইচ্ছে হয় কোরো। তার আগে পর্যন্ত কিছু করার চেষ্টা কোরো না বলে দিচ্ছি।

নে এবার উঠে পড়, আর বকবক করতে হবে না। হাত-মুখ ধুয়ে একটু চুপ করে বোস। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, নতুন শাড়িটা তোকে যা মানিয়েছে, আমারই হিংসে হচ্ছে তোকে দেখে, ছেলেরা দেখলে তো পাগল হয়ে যাবে। তাতে যদি আবার মনের মানুষ কেউ থাকে। কেউ আছে নাকি মৌ?

যাঃ আপনি কি যে বলেন, আমার মতন গরিব ঘরের মেয়েদের সঙ্গে কেউ ভালো করে কথাই বলে না। আবার প্রেম করবে। তা ছাড়া যদি-বা কেউ পছন্দ করেও আমি পাত্তা দেব কেন? সবার আগে আমার পড়াশোনা। ভালো ফল করে একটা চাকরি পাওয়া আমার লক্ষ্য। আমাদের সংসারের যা অবস্থা, তাতে আমার মতো মেয়ের ওসব মানায় না বউদি।

ওরে পাগলি, তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। তুই আমাদের বোন, তুই কেন ওসব করতে যাবি তাই না? চল এবার, তোর দাদারা কি করছে, দেখি গিয়ে।

তিয়াসা মৌকে সাথে নিয়ে সোজা বসার ঘরে এসে দ্যাখে অর্ক, শুভেন্দু কথা বলছে। তিয়াসাই বলল, এবার ওঠে তোমরা, আজ আর বসে বসে সময় নষ্ট করলে চলবে না। অর্ককে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমিও যাও ওদের সঙ্গে গোছগাছ করতে সাহায্য করবে। না হলে সব ভুলে বসে থাকবে।

অর্ক বেশ জোর দিয়েই বলল, তার চেয়ে তুমি যাও ওদের সাথে। ভাইয়ের বাড়িটাও দেখে আসবে, মাসিমা, মেসোমশায়ের সাথে পরিচয়ও হয়ে যাবে, তার সঙ্গে ভাইয়ের ব্যাগগুলোও গুছিয়ে দিয়ে আসবে। তুমিই বলো, এসব কি পুরুষ মানুষের কাজ।

মৌ একরকম জিদ ধরে বসল, তিয়াসাকে তাদের বাড়ি যেতেই হবে। তিয়াসা শাড়ি বদলে পরিকে ও শাশুড়িমাকে বলে, বেরিয়ে পড়ল ওদের সঙ্গে। সবাই হাঁটতে হাঁটতেই চলল, অর্ক নীল নিঃশব্দে থেকে গেল। শুভেন্দুরা বাড়ি চলে গেল, মৌ বাড়িতে ঢুকে না ঢুকেই মাকে ডাকতে লাগল। মা, মেয়ের গলা শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মৌ তিয়াসাকে দেখিয়ে বলল, ইনি কে জানো? তোমার গুণধর ছেলের দিদি। আর আমার বউদি।

অনিতাদেবীকে প্রণাম করল তিয়াসা। অনিতাদেবী তিয়াসাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার কথা তো আমার ছেলে রোজ বলে। কিন্তু আজ তুমি নিজে এসেছ ভাইয়ের ঘরে। এসো আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমার কাকাবাবু মনে হয় ঘুমোচ্ছেন, উনি ঘুম থেকে উঠলে দেখা হয়ে যাবে।

তিয়াসা বলল, আমি এসেছি ভাইয়ের ব্যাগপত্র গুছিয়ে দিতে। মৌকে নিয়ে ওই কাজটা আগে সেরে নিই। তারপার যা হবার হবে। মৌ তিয়াসাকে নিয়ে শুভেন্দুর ঘরে গেল। ঘরের অবস্থা দেখে তিয়াসা বলল, মৌ ঘরটাকে গুছিয়ে রাখতে পারিস না? বোন থাকতেও এই দশা ঘরের কেন থাকবে বল তো? তুই দেখছি শুভেন্দুর মতন একটি ভূত।

প্রথমে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে ঘরের বিছানা ও বইপত্রর সব গোছগাছ করে তবে থামল তিয়াসা। শুভেন্দুকে ঘরে ডেকে সব বুঝিয়েও দিল নিজে। তারপর মৌকে নিয়ে বাইরে এসে দেখল দেবেনবাবু বসে রয়েছেন। মৌ কাছে এসে তিয়াসার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, বাবা, এই সেই তিয়াসাবউদি, দাদা প্রতিদিন যার নাম করে।

তিয়াসা প্রণাম করতে করতেই জিজ্ঞেস করল কাকাবাবু, আপনি এখন কেমন আছেন বলুন?

দেবেনবাবু বললেন, আমার আর এই বয়সে থাকা, ওই আছি একরকম। তোমরা সব ভালো আছো তো?

হ্যাঁ কাকাবাবু ভালো আছি।

তোমার মেয়েকে নিয়ে আসোনি?

না, ওতো এখন মামা বাড়িতে ওর দিদার কাছে থাকে। তিয়াসা বলল আজ তা হলে আসি কাকাবাবু। দেবেনবাবু বললেন, ঠিক আছে সে তা হলে, তবে আবার এসো কিন্তু মা। শুভেন্দু চলে যাচ্ছে চাকরিস্থানে, এবার যে আমাদের কে দেখবে, জানি না।

আচ্ছা কাকাবাবু আমাদের উপর ভরসা হয় না আপনার? নীল নিঃশব্দ যখন রয়েছে তখন আপনাদের দেখবার লোকও রয়েছে। কথাগুলো বলতে বলতে শুভেন্দুকে ডাকল তিয়াসা। মৌ তো কাছেই ছিল। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিয়াসা শুভেন্দুর সাইকেলে উঠল। শুভেন্দু সোজা বাড়িতে পৌছে দিয়ে এল দিদিকে। আজ দিদির কথা রাখতে পারল না সে। তারপর সাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে এল নীল নিঃশব্দে।

অর্ক সেন তখন নীল নিঃশব্দে বসেছিল একা। তখন পর্যন্ত আর কেউ এসে পৌছায়নি। একটু পরেই ডা. অমল চৌধুরি, মন্টু, সনাতন, আরো অনেকেই এসে উপস্থিত হল। ডা. অমল চৌধুরি বললেন, কি শুভেন্দু তুমি তা হলে আগামীকাল যাচ্ছ তো?

হ্যাঁ কাকাবাবু, আগামীকাল অর্কদা আমাকে পৌছাতে যাচ্ছে। আপনারা যারা বাড়িতে থাকছেন অর্কদা ফিরে না আসা পর্যন্ত নীল নিঃশব্দের সব দায়িত্ব আপনাদের উপরেই থাকছে, দেখবেন, নীল নিঃশব্দের যেন বদনাম না হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি তো বুড়ো মানুষ, আমরা পক্ষে কি দেখভাল করা সম্ভব? অর্ক তখন বলল, আপনি আমাদের সকলের গার্জেন। আপনি শুধু সময় মতো ছেলে মেয়েদের ডেকে, কাজটা বুঝিয়ে দেবেন, তাহলেই দেখবেন, নীল নিঃশব্দ গড়গড় করে এগিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া, মন্টু, সনাতনরা থাকছে। ওদের ওপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন। ওরা খুব ভালো ছেলে।

এইসব কথাবার্তা চলাকালীন তিয়াসা সমাদ্দার উপস্থিত হল নীল নিঃশব্দে, এবার শুভেন্দুর বিদায় নেবার পালা। সে একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর অর্কই কথা প্রসঙ্গে বলল, শুভেন্দুর বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আমরা সকলেই প্রায় জানি। তাই আমার প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, আমরা যেন ওদের বাড়ির সদস্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই। শুভেন্দু যতদিন পর্যন্ত না টাকা পাঠাতে পারছে, ততদিন, আমরাই যেন ওদের দায়িত্ব বহন ও পালন করতে কুণ্ঠা বোধ না করি।

আজ আর আমরা বেশি দেরি করব না। ও হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে

গেছলাম। তিয়াসার ব্যাপারেও আমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আর অন্যান্য শিক্ষকমশায়দের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। ডাক্তারবাবু এই ব্যাপারটায় উদ্যোগী হলে আমরা খুশি হব। তারপর শংকরদাদের উপরও একটু নজর রেখে চলতে হবে। ওদের মতন মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। হিংস্র জানোয়ারের মধ্যেও প্রেম আছে। কিন্তু ওদের মধ্যে তাও নেই। এরা ভোগ ছাড়া কিছু জানে না। সকাল হলেই তেল সিঁদুর মেখে, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের অফিসে বসে ছক কষতে শুরু করেন, কাকে, কিভাবে বাঁশ দেওয়া যাবে, কার সঙ্গে কার ঝামেলা লাগিয়ে দিলে উভয় পক্ষের কাছ থেকেই টাকা রোজগার করা যাবে। নিজেরা কর্মচারীদেরকে কর্ম-সংস্কৃতির জন্য বড়ো বড়ো লেকচার দিচ্ছেন, আর নিজেরা অফিস না করেই সরকারের মাইনেটা বেহায়ার মতন গুণে নিচ্ছেন। ডাক্তারবাবু, তিয়াসা আর পরির উপরেও নজরদারি রাখবেন।

ওই শংকরদারা পারেন না, এমন কাজ বোধ হয় আছে কিনা আমার সন্দেহ। তবে ওনারা সব ভগবানের অংশবিশেষ। ওনারা সব বিশেষ বিশেষ ক্ষমতায় অধিকারী। মানুষকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, আর সেই দু-হাতে পিস্তল, ছুরিতে ভর্তি থাকে। যখন যেটা প্রয়োজন, তখন সেটা ব্যবহার করেন।

মোটামুটি দিন চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব আমি। পারলে আরও তাড়াতাড়ি আসব। তা ছাড়া দেরাদুন যাচ্ছি যখন একটু ভুগোলটা জেনে আসব না, তা কী করে সম্ভব। তা হলে এই পর্যন্ত কথা হয়ে রইল, সবাই শুধু একটু চোখ-কান খোলা রেখে, কাজ করে গেলেই হবে। ডাক্তারবাবু, এবার উঠে পড়ুন, মন্টু ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আয়। মন্টু তৈরি ছিল গাড়ি বের করে ডাক্তারবাবুকে মন্টু পৌঁছোতে গেল। কিন্তু সে ফিরে আসবার আগেই সবাই বাড়ি চলে গেছে।

পরের দিন ভোরবেলা বাস ধরে অর্করা হাওড়ায় পৌঁছে গেল। তারপর অমৃতসর মেল ধরে দেরাদুন। দেরাদুন পৌঁছে দিয়েই, অর্ক শুভেন্দুর কাছ থেকে বিদায় নিল। অর্ককে স্টেশনে ট্রেনে তুলতে এল শুভেন্দু। যথারীতি ঠিক সময়ে ট্রেন আসাতে অর্ককে তুলে দিয়ে ফিরে গেল ট্রেনিং ক্যাম্পে।

অর্ক ট্রেনে একা একা বসে ভাবছিল, শুভেন্দুর কথা। যে ছেলেটাকে আজ সে পৌঁছে দিয়ে গেল সেই ছেলেটাই কিছুদিন পরে ডি. এস. পি. না-হলে এস. পি. হয়ে দেশে ফিরবে। ভাবতে যেন একটা রোমাঞ্চ হচ্ছে। তখন শুভেন্দু মুখার্জি গাড়িতে চড়বে প্রতিদিন। ঝকঝকে বাংলোয় বাস করবে, গোটা পরিবার নিয়ে। যে ছেলেটা, দুদিন আগে পর্যন্ত একটা মাটির ঘরে বাস করত, তার এতবড়ো পরিবর্তন

হবে জেনে, মনে মনে অর্ক সেন খুব খুশি হল। শুভেন্দু পোস্টিং পাবার পর ইচ্ছে করলেই বাবা, মা আর মৌকে নিয়ে এসে রাখতে পারে নিজের কাছে।

কিন্তু শুভেন্দু তা করবে না। কারণ তা যদি করে তাহলে মধুপুরের সঙ্গে তার আর যোগযোগ থাকবে না। তাছাড়া নীল নিঃশব্দও তাকে আর কোন দিন কাছে পাবে না। এইভাবে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। পরদিন ট্রেন থেকে নেমে, বাস ধরে যখন কানপুর স্ট্যান্ডে নামল তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। আগে থেকেই ডাক্তারবাবুকে ফোন করে জানিয়ে রেখেছিল শুভেন্দু। তারপর অর্কও বাসে উঠে মোবাইল থেকে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে দিয়েছিল। ডাক্তারবাবুও যথারীতি ফোন পেয়ে মন্টুকে গাড়ি নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্কর বাস এসে স্ট্যান্ডে থামতেই, মন্টু এগিয়ে গিয়ে ব্যাগপত্তরগুলো নিজের হাতে নিয়ে গাড়িতে রাখল। অর্ক বলল, কেন ভাই শুধু শুধু গাড়ি আনতে গেলি, সাইকেল নিয়ে এলেই পারতিস।

মন্টু বলল, অর্কদা, আপনার কিন্তু ভুল হচ্ছে।

কেন মন্টু, তুই একথা বলছিস কেন?

আপনার বোধ হয় খেয়াল নেই, যে, আপনার অনুপস্থিতিতে ডাক্তার অমল চৌধুরি এখন নীল নিঃশব্দের দায়িত্বে, তিনি যেমনটি আদেশ করেছেন আমি শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালন করেছি। অতএব আপনিও এখন তাঁর নেতৃত্বে। অতএব এসব নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভালো।

মন্টু, এই চারটা দিন। সব ঠিকঠাক চলেছে তো! কোথাও কোনোরকম ভুল-ভাল হয়ে যায়নি তো?

না অর্কদা, ক-টা দিন মোটামুটি কেটে গেছে। তবে কি জানেন, আপনি না থাকলে মনে জোর পাইনা আমরা। ওইখানেই আমাদের যা ত্রুটি বলতে পারেন। তবে ডাক্তারবাবুও কম যান না, দেখে মনে হল উনি পারবেন।

এটাই তো আমি চাইছিলাম। আমি না থাকলেও যেন নীল নিঃশব্দের কাজটা চলে যায়। আজ দেখলাম সঠিকভাবেই ক-টা দিন চলে গেল। আর চলবে নাই-বা কেন বলো তো, তোদের মতো ছেলেরা পাশে থাকলে অত চিন্তা করার কি আছে বল? না ভাই আজ আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চল এখন তাড়াতাড়ি, অমলবাবু হয়তো আমার জন্যে এখনো অপেক্ষা করছেন।

একসময় গাড়ি এসে পৌঁছোল নীল নিঃশব্দের কাছে। সনাতন, তন্ময়, তিয়াসা সবাই ছুটে বেরিয়ে এল, অর্ককে দেখবে বলে। অর্ক গাড়ি থেকে নেমে সোজা

ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে ঢুকেই দেখল অমলবাবু তখনও বসে রয়েছেন। অর্ককে দেখেতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন কোনো অসুবিধে হয়নি তো রাস্তায়।

না কাকাবাবু, আমার কোনো রকম অসুবিধে হয়নি! আপনি ভালো আছেন তো? কাকিমা?

আমি ভালোই আছি। নাও, বাবা, তোমার নীল নিঃশব্দের দায়িত্ব, এই বুড়ো বয়সে কী, এত ঝক্কি ঝামেলা সামলানো যায়। তুমি এসে পৌঁছেছ মানে আমি বাঁচলাম।

সে কী কাকাবাবু, ছেলেরা বলছে আপনি বেশ ভালোই পারবেন। ক-টা দিন তো সুন্দর ভাবেই কাটিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আজ আর কিছু শুনব না। আবার আগামীকাল সব শোনা যাবে। মন্টু ব্যাগপত্তরগুলো নামিয়ে রেখে, কাকাবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আয়। তুই একটু তাড়াতাড়ি ফিরবি, রাত অনেক হয়েছে, সবাইকেই তো বাড়ি ফিরতে হবে।

মন্টু অমলবাবুকে পৌঁছোতে গেলে পর অর্ক তিয়াসাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি মৌদের বাড়ি গিয়েছিলে?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

ওরা সবাই কেমন আছেন?

সকলে ভালোই আছেন।

তুমি আগামীকাল সকালে একটিবার যেয়ো ওদের বাড়ি, দরকার আছে। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে একবার অমলেন্দুবাবুর কাছে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।

ঠিক আছে, তাই হবে।

বলতে বলতেই মন্টু ফিরে এল, গাড়ি গ্যারাজ করে দিয়ে সে বলল, অর্কদা, আমি তা হলে এখন অসছি, সনাতন, তন্ময় এরাও বেরিয়ে পড়ল। অর্ক মন্টুকে বলল, কি হল, তুই চলে যাচ্ছিস যে, ঘরে তালা দিবি, আলোগুলো নেভাবি, তারপর তো যাবি। তা ছাড়া আমরা বসে থাকব নাকি, আমাদেরও তো বাড়ি ফিরতে হবে।

মন্টু, তন্ময় মিলে সব গোছগাছ করে ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিল। অর্কর বাড়ি যাবার রাস্তায় তিয়াসাদের বাড়ি, অতএব সে তিয়াসাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। রঞ্জনবাবু ছেলেকে নিয়ে ভাবছিলেন যে ছেলেটা অতদূরে গেছে। তারপর ফেরার সময় আবার একা একা ফিরতে হবে। ট্রেনে যদি শরীর-টরীর খারাপ হয় তা হলে কি অসুবিধেই না হবে। খাওয়াদাওয়া সেরে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন তিনি।

এমন সময় অর্কর সাইকেলের বেল বেজে উঠল। রঞ্জনবাবু, তাড়াতাড়ি চাবি নিয়ে এসে গেটের তালা খুলে দিলেন। ছেলেকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলেন। অর্ক সাইকেল রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, বাবা, তুমি কেমন আছো? মা কেমন আছে? আমরা ভালোই আছি বাবা, রঞ্জনবাবু বললেন।

মা, ও মা, কোথায় তুমি? ডাকতে ডাকতে নিজের ঘরে চলে গেল অর্ক। জামা কাপড় ছেড়ে, বাথরুমে, গিয়ে ভালো করে স্নান সেরে ঘরে ফিরে এল। তারপর খাবার ঘরে গিয়ে দেখল, মা যথা নিয়মে খাবার দিয়ে বসে রয়েছেন। কিন্তু মুখে কোন কথা বলেননি। অর্ক মাকে ওই অবস্থায় দেখে বলল, মা গো, কেন মিছিমিছি তুমি রাগ করে বসে আছো। তোমার ছেলে তো কিছু খারাপ কাজ করে বাড়ি ফেরেনি, যে তুমি অমনি করে মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে? মা তখনো চুপচাপ দেখে অর্ক বলল—ঠিক আছে মা, তুমি যদি কথা না বলো তা হলে আমার খেয়ে লাভ নেই। আমি চললাম।

অমনি খপ করে অর্কর হাতটা ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন মা, তারপর বললেন, আচ্ছা অর্ক, তুই কি মনে করেছিস আমরা মরে গেছি?

তুমি একথা কেন বললে মা?

কেন বলছি, তুই বুঝতে পারছিস না? আর সত্যিই যদি বুঝতে না পারিস, তা হলে বলব, তোর আর বুঝে লাভ নেই।

কি এমন ঘটনা ঘটল যে তুমি এমন করে আমার উপর খেপে গেলে?

তা হলে তুই শুনতে চাস?

নিশ্চয় শুনব, চারদিনে কি এমন ঘটে গেল, যাতে করে তুমি অস্থির হয়ে উঠেছ?

তোর শংকরদার চ্যালাচামুণ্ডারা এসেছিল গত পরশুদিন। তারা এসে বলে গেছে যদি তুই তিয়াসার সঙ্গ ত্যাগ না করিস তা হলে তোকে এবং তিয়াসাকে, এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে বলেছে। আচ্ছা তুই-ই বল খোকা, আমি মা হয়ে কি করে সহ্য করব। আরও সব কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে গেছে, যেগুলো তোর সামনে আমি উচ্চারণ করতে পারব না।

এই ব্যাপার। এতেই তুমি ভয় পেলে মা? তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ, তুমি অর্ক সেনের মা। কত মা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমাকে তারা বলে তুমি নাকি রত্নগর্ভা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শংকরদারা যাই বলুক না কেন, তাকে নিয়ে বেশি ভাববার দরকার নেই।

তুই সত্যিই যে কি চাস, আমি আজও বুঝতে পারলাম না।

তোমার বুঝে কাজ নেই মা। যারা শুধু নিজেরটা ছাড়া কিছু ভাবতে শেখেনি, যাদের চরিত্র বলে কিছু নেই, তার আমার সমালোচনা করতে আসে কোন সাহসে?

ওরা যে, দস্যু প্রকৃতির, কখন যে কি করে বসবে?

ওরা সবচেয়ে ভিতু। কারণ ওরা যে অজস্র অন্যায়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই ওরা সত্যের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়। তাই ওরা ভোটের সময় মা, বোনেদের হাতে থানকাপড় ধরিয়ে দিয়ে বলে ভোট দিতে গেলে, বা পঞ্চায়েতে প্রার্থী হলে, স্বামীদের আর জীবন্ত পাবে না। তাই আগে ভাগেই থানটা দিয়ে গেলাম যাতে আর কিনতে না হয়। আর তুমি সেই ভিতু কাপুরুষগুলোকে নিয়ে ভাবছ? যাও মা খেয়ে দেয়ে ঘুমোও তো যাও। অতসব ভেবো না আর, অর্ক সেন তোমার পৌঁছে গেছে এমন এক ঠিকানায়, যেখান থেকে শংকরদাদের মতন লোকেরা, তাকে কোনোদিন টেনে নামাতে পারবে না। কারণ ওদের সঙ্গে আমাদের চলার পথটা সম্পূর্ণ উলটো। আমরা মানুষের সেবা করি, আর ওরা সেই মানুষকে ঘৃণা করে।

যা বাবা, তোকে আর বকতে হবে না। তুইও শুয়ে পড়গে যা। মা হয়ে মনটা সব সময় খচখচ করে তো, তাই ভেবে মরি। ছেলের বিরুদ্ধে কেউ কিছু খারাপ কথা বললে, কোন্ মায়ের ভালো লাগে বল?

রঞ্জনবাবু, বারান্দা থেকে সব কথাই শুনছিলেন। কিন্তু ছেলেকে তিনি কোন কথাই বলেননি। কারণ তিনি জানতেন অর্ক সেন কোনো অন্যায় করতে পারে না, তা ছাড়া তিনিও তো চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকেন না। মানুষের মধ্যেই মিলেমিশে সমাজের কাজ করেন। মানুষ অর্ক সম্পর্কে কি বলছে, কি ভাবছে। তা তাঁর অজানা নেই, তাই ওরা শুতে যাবার পর, তিনিও শুতে গেলেন।

পরের দিন যথারীতি সকালে উঠে শুভেন্দুদের বাড়ি হয়ে নীল নিঃশব্দে এল অর্ক। একে এক প্রায় অনেকেই এল। নিজেদের মধ্যে সব শুভেন্দুকে নিয়ে গল্প হচ্ছিল। কিন্তু অমল চৌধুরি এসে পড়ায় সব গল্প বন্ধ হয়ে গেল। অর্ক ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু তিয়াসার স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে কথা হয়েছিল কিছু? তা ছাড়া অভিভাবকরা তিয়াসা সম্পর্কে কি বলতে চাইছে। সেটাও সরেজমিনে দেখা উচিত।

অমলবাবু উত্তরে বললেন, হেডমাস্টার বাদে সবাই চায় তিয়াসা স্কুলে যোগদান করুন। আর রঞ্জনবাবু মানে তোমার বাবা অভিভাবকদের বাড়ি ধাড়ি ঘুরে খবর এনেছেন। তাঁরা তো তিয়াসাকে শিক্ষিকা হিসেবে দেখতে চান।

তা হলে কাকাবাবু, আমরা আজ মহকুমাশাসকের কাছে যাচ্ছি। ওনাকে ও এস. আইকে রেখে একটা জরুরি সভার আয়োজন করে আসি। মহকুমাশাসক, ইচ্ছে করলে অভিভাবকদের নিয়ে সভা ডেকে বিদ্যালয়ের সমস্যাগত আলোচনা করতে পারেন!

কথা বলতে বলতে তিয়াসা এসে পৌঁছোল। অর্ক তিয়াসাকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মহকুমাশাসকের কাছে যাবে বলে। মহকুমাশাসক তিয়াসার সমস্যার কথা শুনে বললেন, অর্কবাবু এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা কি বলছেন?

স্যার আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, হেডমাস্টার ও সেক্রেটারি ছাড়া সকলেই একমত যে, তিয়াসাদেবী বিদ্যালয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগদান 'করুক'।

তা হলে তো এ ব্যাপারে ডি. আই. ও এস. আইকে দিয়ে একটা সভা ডাকা যেতে পারে। সভাটা ডাকবেন এস. আই। তাতে আমাকেও একটা চিঠি দিতে বলে দেওয়া হবে। যাতে করে ওই সভায় আমিও উপস্থিত থাকতে পারি। এ ব্যাপারে আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি এস. আই-এর কাছে এক্ষুনি চিঠি সহ লোক পাঠাচ্ছি।

আপনাকে স্যার কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, আপনি সত্যিই মহান।

না অর্কবাবু, মহান আপনারা। যারা এই পচাগলা সমাজটাকে সারিয়ে তুলতে চান। আজকে মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যিই খুব কষ্টের, এত সহজে একজন সত্যিকারের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ দেখুন, আপনি কেমন অবহেলে সমাজের আর্ত মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন।

আমাদের কতটুকু ক্ষমতা বলুন স্যার। আপনারা বরং ইচ্ছে করলে, বহু মানুষকে চরম বিপদ থেকে বাঁচাতেও পারেন।

না, পারি না অর্কবাবু। আমরা এই চেয়ারটায় বসে তা পারি না। আমার কাজের জন্যে ওপরতলাকে জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু আপনাকে তার কিছুই করতে হয় না। আপনি আপনার খুশিমতো যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমি যা খুশি করতে পারি না, নেতা মন্ত্রীরা আমাদেরকে বিভিন্ন সময় হেনস্থা করতেও ছাড়ে না।

দেখুন স্যার, তবুও সদিচ্ছা থাকলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে করা যায়।

হ্যাঁ করা যায়, তবে অনেক ভেবেচিন্তে আমাকে এগোতে হয়। দেখুন না,

অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত, নেতা মন্ত্রীদের কথা মেনে না চললে, সমস্যার অন্ত থাকে না। পুরোপুরিভাবে না হোক, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তাদের চাকর হিসেবেই কাজ করি। তবে সবাই না। অনেকেই করে থাকে।

এই জন্যেই তো কোনো রাজনীতি নয়। মানুষের সেবা করবার জন্যে রাজনীতি করবার দরকার নেই। শুধু অদম্য ইচ্ছে থাকলেই হবে। টাকাপয়সারও অভাব হবে না। তবে নিজেকে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। নাহলে শংকরদারা কবেই শেষ করে দেবে।

শংকরদাটা কে বলুন তো অর্কবাবু?

কেন, উনি ওই এলাকার মস্ত বড়ো নেতা বলতে পারেন, তবে জনপ্রিয় নয়। উনি মানুষের উপর জোর খাটিয়ে নেতা সেজে আছেন। মানুষ তার ভয়ে একরকম কোণঠাসা হয়ে রয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোনোকিছু বলার সাহস নেই কারো।

তা হলে এক্ষেত্রে জনগণ যদি ভয়ে ওনার কথামতো চলে। তখন তো সব কেঁচেগন্ডূষ হয়ে যাবে মশায়। অর্কবাবু খুব ভালো করে ভেবে দেখুন।

ভেবে দেখবার মতন কিছু নেই স্যার। বিষয়টা খুবই জটিল, কিন্তু আমাদের তো ঝুঁকি নিতেই হবে। না হলে আমরা পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলের নামে গুন্ডামি করতে পারব না। আমরা বড়ো জোর আপনাদের মতন ভালো মানুষের সাহায্য চাইতে পারি। আমাদের এ-ছাড়া কিছুই করার নেই।

তা হলে আপনারা এখন আসুন, আলোচনা মাফিক ঠিক কাজ হয়ে যাবে।

অর্করা সত্যিই ভাবতে পারেনি, অমলেন্দুবাবু এভাবে তাদের সাহায্য করতে আসবেন। মনের মধ্যে একবুক আশা নিয়ে মধুপুরে ফিরে এল। মধুপুরে ফিরে আসার পর তিয়াসা অর্ককে বলল, দ্যাখো, এখনো দুপুরের খাওয়া হয়নি তোমার। তুমি বরং আমাদের বাড়িতে চলো, ওখানে ডাল ভাত দুটি খেয়ে নেবে। ঘড়িতে দ্যাখো, প্রায় তিনটে বাজছে, আর বাড়ি যেতে হবে না। কী হল অর্ক, কিছু বলো? ঠিক আছে তাহলে আমাদের বাড়ি যাচ্ছ ধরে নিচ্ছি। কারণ "মৌনম সম্মতি লক্ষণম"।

দুজনেই সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে অগত্যা তিয়াসার বাড়িতে এসে উঠল। তিয়াসা পরিকে ডেকে বলল, অর্কর জন্য খাবারটা একটু গরম করে দে, আমার ঠান্ডা হলেই চলবে, মেয়েদের জন্যে কোনো কিছুর বারণ নেই। ভিজে ভাত, আধপোড়া ভাত, সবই খেতে হয় পোড়া পেটের জন্যে। তিয়াসা নিজেই আসন পেতে অর্ককে খেতে দিল। অর্ক জিজ্ঞেস করল, তুমি খাবে না?

না খাব না। আমার এখন আর খিদে নেই।

এটা তুমি ঠিক করলে না আমি একা বসে বসে খাব, আর তুমি দেখবে, এখানেই আমার আপত্তি। বাড়িতে যে খাবারটা ছিল, দুজনে ভাগ করে খেতে পারতাম। তা না করে সব তুমি আমাকে দিয়ে নিজে উপোস করবে। সেটি আর হচ্ছে না। এই খাওয়া বন্ধ করলাম।

কী হল অর্ক, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কেন, মাথা খারাপ হতে যাবে কোন্ দুঃখে?

যদি বলি সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা অর্ক তোমার মাথায় কি একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। তোমার খাওয়া শেষ না হলে কি করে খাই বলো তো?

আগে বলবে তো। শুধু শুধু তোমার খাওয়ার দেরি করে দিলাম। ঠিক আছে, এবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছি।

অর্কর খাওয়া শেষ হলে পরি এসে তিয়াসার খাবার দিয়ে গেল। সেও কোনো রকম করে মুখে তুলে থালায় জল ঢেলে পরিকে ডেকে বলল, চারদিকে খেয়াল রাখিস। আর মনে রাখিস, অর্ক সেন আছে এই বাড়িতে। যদিও উনি বেশিক্ষণ থাকবেন না তবুও তো ভয় করে। ওকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করুক, তা আমি সইতে পারব না। তিয়াসা দ্রুত পায়ে বসার ঘরে গিয়ে দ্যাখে, অর্ক তার আসার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে আসতেই অর্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর দেরি করা চলে না, আমি এখন নীল নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছি। বাড়ি এখন আর যাব না। ওখানেই একটু বিশ্রাম নিয়ে নেব।

তিয়াসা আজ মন খারাপ করেই অর্ককে বিদায় জানাল। সে বিদায় জানাতে গিয়ে যে কেঁদে ফেলল নিজেও বুঝতে পারল না। পরি কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু সে দিদিমণিকে কিছু বলল না।

যথারীতি অমলেন্দুবাবু এস. আই-কে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন। যাতে উনি সেবাগ্রাম হাইস্কুলের অভিভাবকদের আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর স্কুলে ডেকে রাখেন। সেই সভায় উনি এবং ডি. আই. উপস্থিত থাকবেন। সভার সময় — দুপুর ২টায়।



এস. আই. পরিমলবাবু চিঠি দিয়ে সেবাগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও

সম্পাদকমশাইকে জানিয়ে দিলেন, প্রধানশিক্ষকমশায়, তপন ঘোষ, প্রতিটি অভিভাবককে, চিঠি দিয়ে পাঠালেন। উক্ত সভায় উপস্থিত থাকবার জন্যে।

ব্যাপারটা নিয়ে তপনবাবু শংকরদার কাছে গেলেন পরামর্শ করতে এবার কি করা যাবে৷ শংকরদা সব শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর তপনবাবুকে বললেন, অত চিন্তার কি আছে, আপনি নাকে সরষে তেল দিয়ে ঘুমোতে যান। সভার দিন যা হবার হবে। এ নিয়ে যা ভাববার আমি ভাবব। তাছাড়া যদি ওইদিন সভায় উপস্থিত অভিভাবকরা তিয়াসাকে নিতে বলেন, তা হলে তো আর কিছু করার থাকবে না। তখন বাধ্য হয়েই নিতে হবে। কিন্তু তারপর আমি দেখে নেব ওই অর্ক সেনকে। বাছাধন খুব বাড় বেড়েছে। আমাদের ক্ষমতার এখনো কিছুই প্রয়োগ করিনি, তাতেই দেখুন না কেমন ল্যাজেগোবরে হয়ে গেছে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।

তা যা বলেছেন আপনি।

আমরা সব সময় ঠিকই বলি তপনবাবু, কিন্তু বিরোধীরা মানুষকে মিথ্যে বলে বলে কেমন খেপিয়ে দেয় দেখছেন। শালাদের তো কোনো কাজ করতে হয় না। তাই লোকের কানে ফুসমন্তর দেওয়া ছাড়া কি আর করে বলুন। তবুও কিছু করছি, এই যা সান্ত্বনা।

কিন্তু অর্ক সেন তো আপনার বিরোধী নেতা নয় স্যার।

ওই হল। নেতা সাজতে কতক্ষণ বলুন তো? আগে সমাজ সেবার নাম করে ভিতটা তৈরি করে নিচ্ছে, তারপর দেখবেন মালটা ঠিক লাইনে এসে যাবে। অমন কত সমাজসেবী দেখলাম। অর্ক সেন তাদের থেকে আলাদা হতে যাবে কেন?

আপনি যাই বলুন স্যার, অর্ক সেন ছেলেটা একটু অন্য রকমের।

হতে পারে, আমি অস্বীকার করছি না। তবে কি জানেন, অর্ক সেনকে আমি ছাড়ব না। আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। তিয়াসাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যে অন্যায় সে করেছে, তার কোনো ক্ষমা নেই। দেখতে পাচ্ছেন না, দিন দিন দুজনে কেমন ডানা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীল নিঃশব্দে নাকি সব সময় তিয়াসা অর্কর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

তাতে আপনার কি?

আপনি জানেন না, তপনবাবু। যেনতেনপ্রকারেণ ওই তিয়াসাকে আমার চাই। না পেলে, অর্ক সেনকেও পেতে দেব না, মিলিয়ে নেবেন।

স্যার, এবার তা হলে আসছি?

ঠিক আছে আসুন। তবে আগামীকাল সন্ধেবেলা একবার আসবেন, এটা আমার অনুরোধ।

নিশ্চয় আসব স্যার। বলতে বলতে, তপনবাবু উঠে গেলেন। শংকরদা একাই বসে বসে ফন্দি আঁটিতে লাগলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন কথাগুলো তপনবাবুর কাছে না বললেই বোধ হয় ভালো হত। বলা তো যায় না, মানুষের মন বদলাতে কতক্ষণ। তাতে আবার তপনবাবুর মতো মানুষ। ওরা খালি নিজেরটি ছাড়া ভাবতে শেখেনি! তা যা হোক, আগামীকাল সন্ধেবেলা দু-পাত্তর গলায় ঢেলে নিয়ে একটু কড়কে দিলেই ব্যাটা ঠিক হয়ে যাবে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ইজিচেয়ারটায় একটু গা এলিয়ে দিলেন। তারপর ঘড়ঘড় নাক ডাকার শব্দে পাড়া মাথায় তোলার জোগাড়।

এদিকে, নীল নিঃশব্দে চলছে তখন প্রস্তুতি। সন্ধে থেকেই ৫ তারিখের সভা নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলছে আলোচনা আর আলোচনা। কিন্তু শুধু আলোচনা করে বসে থাকলে তো চলবে না। অর্ক সেন সমস্ত সদস্যদের উদ্দেশ্যে তাই বলল, আগামীকাল থেকে আমাদের আবার অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। শেষ বারের মতো প্রত্যেককে বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে হবে, অভিভাবকরা নিশ্চয় বুঝবেন।

তিয়াসাও সভায় উপস্থিত ছিল। সভা শেষ হলে সে বাড়ি যাবার উদ্যোগ নিতেই অর্ক তাকে বসতে বলে কাজে মন দিল। হাতের কাজ সারতে সারতে প্রায় অনেকেই বাড়ি চলে গেছে। শুধু অমল চৌধুরি, মন্টু আর তিয়াসা রয়েছে। অর্ক এবার ওদের সামনেই তিয়াসাকে বলল—তুমি যে আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছ, সেই আগুনে নিজে পুড়ে মরবে না তো। এখনো ভেবে দেখবার সময় রয়েছে। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, এত বড়ো চ্যালেঞ্জ তুমি নিতে যেয়ো না। শংকরদারা তোমাকে আমাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছ। তাছাড়া ৫ই সেপ্টেম্বর তোমার সবথেকে আনন্দের দিন হবে। ওরা সেদিন কোনো প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে। কিন্তু জানো, ওরা হিংস্র শ্বাপদের থেকেও ভয়ঙ্কর। যদি এই পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে, সত্যি সত্যিই আমাদের নিয়ে কিছু কাণ্ড করে বসে, তখন কিন্তু মান অপমানের কথা ভাবলে চলবে না, তাই বলছি যা ভাবার এখনই ভাবতে হবে। তা ছাড়া তোমার মেয়ে বড়ো হচ্ছে। তার ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবার দরকার। সে যখন বড়ো হয়ে শুনবে, তার মা, বাবার মৃত্যুর পর অন্য একটি পুরুষকে ভালোবাসত। তখন তার মনের অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ?

ওসব ভাবনা তোমরা ভাববে বসে বসে। আমি আজকের দিনের মেয়ে হয়ে যতসব পুরোনো ভাবধারাকে আঁকড়ে থাকব, একথা তুমি ভাবলে কি করে। ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচের থেকে এটাকেই আমি শ্রেয় বলে মনে করি। তা ছাড়া তোমার মতো মানুষের মুখ থেকে এধরনের কথা শুনব, এ আমি আশা করিনি। যে সমাজকে ঢেলে সাজাতে চায়, সমাজের অন্যায়ের বিরূদ্ধে লড়াই করতে চায়, সে কি তবে শংকরদাদের মতো কিছু লম্পট চরিত্রহীন মদ্যপকে ভয় পায়?

না তিয়াসা, আমি তোমাকে সেকথা বলতে চাইনি, ওরা যদি কোনোদিন আমাদের নিয়ে অপপ্রচার চালায়, তা হলে তো তোমার এবং তোমার ছোটো মেয়েটার ক্ষতি হয়ে যাবে।

সে ক্ষতির কথা বোঝবার মতো বয়স আমার হয়েছে, তা ছাড়া কিছু শিক্ষা-দীক্ষাও রয়েছে, সবকিছু দিয়ে এটুকু বুঝেছি যে আমার ভালোবাসাকে আমি এইভাবে শেষ করে দিতে পারি না। তা ছাড়া বিধবা-বিবাহ দেশে আইনসিদ্ধ। মেয়ের কথা ধরলে, সে তো এখন মামার বাড়িতে, সে যখন বড়ো হয়ে জানতে পারবে আমাদের কথা, তখন সে-কথা ভাবা যাবে। আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি না থাকলেই হল।

আজকে যত সহজে তুমি কথাগুলো বলছ, সেদিন কিন্তু মেয়ের সামনে আসামি হয়ে দাঁড়াতে পারবে তো? আর তা যদি পারো তা হলে তুমি ভালোবাসার কথা বলতে পারো।



দেখতে দেখতে ৫ই সেপ্টেম্বর কাছে এসে গেল, তপনবাবু আসব আসব করে আসতে পারেননি শংকরদার সান্ধ্য বৈঠকে! কিন্তু একদিন তিনি সত্যিই এলেন, শংকরদা তখন সবে আসর পাততে শুরু করেছেন। তপনবাবু দরজার বেল বাজাতেই, উনি বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কী মশায় দু-এক পাত্তর হয়ে যাক তা হলে।

আপনি যখন বলছেন, তখন আর না বলি কি করে বলুন।

তা রাম না হুইস্কি, কোনটা খাবেন বলুন? না-হলে ভডকা রয়েছে। আপনার পছন্দে যেটা ভালো লাগবে, সেটাই খান। এইভাবে তপনবাবু শংকরদা দুজনে মিলে আকণ্ঠ মদ্য-পান করে, ৫ই সেপ্টেম্বরের সভা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

কিন্তু এই অবস্থায় কোনো আলোচনাই দানা বাঁধল না। শুধু তারা আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। শংকরদা বারবার সেই তিয়াসার কথায় উঠছেন আর বসছেন। আবার তিনি নেশার ঘোরে বেশ কিছু মনের কথা বলে ফেললেন। যেমন, অর্ককে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে, সব ব্যবস্থা পাকা। আর তা যদি না হয় তা হলে অর্ক যেদিন তিয়াসার বাড়িতে আসবে সেদিন ওদের দুজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পঞ্চায়েতে ডেকে ওদের বিচার করা হবে। যাতে ওরা নিজেরাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তপনবাবু সমস্ত কথা শুনে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন কি ভুলটাই না করেছেন। যদি না আসতেন তাও ছিল ভালো, কিন্তু এখন তো পালাবারও কোনো পথ নেই। তাছাড়া তিনি শুধু মাতাল নন, নারীলোভীও বটে! প্রতিরাত্রে নাকি তাঁর নতুন মেয়েছেলে লাগে। তার জন্যে যা টাকা লাগে তা উনি খরচ করতে পিছপা নন। ওনার নজরে যদি কাউকে ভালো লেগে যায়, তা হলে তো কোনো উপায় নেই। তার সর্বনাশ উনি করেই ছাড়বেন! তপনবাবু এবার ঘামতে লাগলেন। শুধু মনে মনে পালিয়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু সে উপায়ও নেই, পা তখনো টলছে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে হস্টেলে ফেরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একরকম বাধ্য হয়েই চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দরজার বেল বাজার শব্দ শুনতে পেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন। শংকরদা কোনো রকমে দেওয়াল ধরে ধরে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, দুটো যণ্ডা মার্কা লোক ঘরে ঢুকে বলল, বাবু আজ একেবারে তাজা মাল নিয়ে এসেছি। রাত অনেক হয়েছে আর দেরি করবেন না বাবু। ছুঁড়িটা বড়ো লাফালাফি করছে। শংকরবাবু শুনে বললেন, তা করবে না। .... হলে তো একটু লাফাবেই। তোরা চল, আমি যাচ্ছি। লোক দুটোকে চলে যেতে দেখে আর তাদের মুখের কথা শুনে তপনবাবুর হার্টফেল হবার জোগর।

শংকরদা হঠাৎ বললেন, কি মাস্টারবাবু, তা হলে এক যাত্রায় পৃথক ফল করে কি লাভ বলুন, চলুন ওখানে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে আসবেন। শুনলেন তো নিজের কানে একেবারে আনকোরা, তা মাস্টারবাবুর রুচিতে বাধবে নাতো? তবে হ্যাঁ, আপনি আমার সঙ্গে যান আর নাই যান, এখানের কথা যদি কোনো রকমে ফাঁস করেছেন তাহলে অর্ক সেনের সঙ্গে আপনার নামটাও আমার খতমের তালিকায় যুক্ত হয়ে যাবে বলে রাখলাম।

রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, রাস্তায় কোনো লোকজন নেই, তপনবাবু কোনোরকম করে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা হস্টেলের দিকে পা বাড়ালেন। নেশা তখন উবে

গেছে। তিনি কোনরকমে হস্টেলের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে মনে মনে বললেন, ঈশ্বর, এরা কীভাবে এবং কবে শেষ হবে? এই যাদের চরিত্র, তারা নাকি দেশের নেতা। এরাই নাকি মানুষের ভালো করবে, তা হলে খারাপটা কারা করবে, আর এতদিন এই মানুষটার কথায় একজন সহ কর্মীর বিধবা স্ত্রীর প্রাপ্য চাকরি নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় সঙ্গ দিচ্ছিলাম, আজ থেকে শপথ করছি, এসব মানুষের সান্নিধ্যে থাকাও পাপ। কিন্তু উপায় কী, মানুষের কাছে তো ওর জন্য আমিও হেনস্থা প্রতিপন্ন হয়ে গেছি। তবে প্রভু আর নয়। ৫ সেপ্টেম্বরের সভা থেকেই ওনার কাছ থেকে আমি সরে আসবই।

আর ওইদিনই তিয়াসা বউমার যোগদানের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব। এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তপনবাবু মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, এতদিন একটা জীবন্ত শয়তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যা করেছেন, ভুলই করেছেন, আর কখনো শয়তানকে প্রশ্রয় দেবেন না। এরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি উপকারে লাগবে, হয়তো বা কোনোদিন আমারই বাড়ির মহিলাদের উপর নজর পড়বে না, কে বলতে পারে। অতএব এহেন শয়তানদের কাছ থেকে শত যোজন দুরে থাকাই ভালো। না-হলে সমূহ বিপদ! সারা রাত তিনি ভেবে ভেবে চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় বসে বসে ঝিমোতে থাকলেন।

হঠাৎ কিছু মানুষের চিৎকারে তাঁর ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল। তিনি উঠে দেখলেন যে কিছু মেয়ে-পুরুষ স্কুল মাঠের দিকে দৌড়োচ্ছে। সকালের সূর্যটা সেই সবে মাত্র পুব আকাশে দেখা দিতে শুরু করেছে। না জানা পাখির দল বাঁশ বাগানে তখন কিচিরমিচির কলরবে মুখর হয়ে রয়েছে। কেউ কেউ প্রাতঃক্রিয়া সারতে বেরিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে টিউশন পড়তে ছুটছে। হাটুরেরা জোর পায়ে মাথায় পসরা নিয়ে হাঁটছে তো হাঁটছেই। তার মাঝখানে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে গেল। সবাই একদিকে ছুটছে। তপনবাবু নিজেও দরজাটা খুলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। যারা দৃশ্যটা দেখে ফিরছিল। তাদেরকে বলতে শুনলেন যে, কারা একটি কচি মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। আহা রে! ঐ রকম একটা ফুটফুটে মেয়ে, তা দেখে অমানুষগুলোর একটুও করুণা হল না! কি নিষ্ঠুর-রে বাবা!

তপনবাবু আর এগোতে পারলেন না। পা দুটো যেন তার অবশ হয়ে থাকল। মনে পড়তে লাগল গতকাল রাতের কথা। "বাবু মালটা একেবারে আনকোরা ছুঁড়িটা খুব লাফালাফি করছে"। কথাগুলো যেন বারবার তাঁর কানে বাজতে লাগল। তারপর ছটফট করতে লাগলেন, কিন্তু মুখ থেকে কোনো কথা বেরুল না।

শুধু চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা। হয়তো বা মনের অন্ধকারটা, অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল প্রভাতের শিশির বেলায়।

পায়ে পায়ে তপনবাবু ফিরে এসে আবার বসে পড়লেন ইজি চেয়ার-টায়। তারপর চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকলেন শংকরদার বলা কথাগুলো।

তারপর হস্টেলের একদল ছেলে এসে বলল, স্যার কারা যেন আমাদের স্কুলের ক্লাস নাইনের এক ছাত্রীকে মেরে ফেলে দিয়ে গেছে ফুটবল মাঠের এক কোণে।

তপনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মেয়েটিকে তোমরা চিনতে পেরেছ? ছেলেরা বলল হ্যাঁ স্যার। ও ক্লাস নাইনে পড়ত, নাম শকুন্তলা আড়ি। খুব গরিব ওরা। ওর বাবার খুব অসুখ, মা কোনোরকম করে লোকের জমিতে মজুর খেটে, ওকে স্কুলে পাঠাত, শকুন্তলাও ছুটির দিনে মার সঙ্গে মজুর খাটত, কিন্তু ওকে বাঁচতে দিল না সমাজ।

তপনবাবু ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে দেখতে গেলেন শকুন্তলাকে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি! ছেঁড়া ফ্রকটা পাশে পড়ে রয়েছে, সারা শরীরে কামড়, আর নরপশুদের নখের দাগ জ্বলজ্বল করছে। সবার চোখে জল, মেয়েটিকে দেখে সবার কথা বন্ধ হয়ে গেছে! তপনবাবু গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে শকুন্তলার শরীরটা ঢেকে দিলেন। আর তিনিও বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগছেন। ছেলেরা যারা এসেছিল তারা তাদের মাস্টারমশায়কে ধরাধরি করে হস্টেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন! তপনবাবু ছেলেদের বললেন তোরা এখনই অর্ক সেনকে খবরটা পৌঁছে দে, তারপর যা হবার হবে।

ছেলেরা কয়েকজন মিলে অর্ক সেনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল, কিন্তু তারা পৌঁছোনার আগেই খবরটা অর্ক সেনের কাছে লোকের মুখে মুখে পৌঁছে গেছে। অর্ক সেন খবর পাওয়া মাত্রই থানায় ফোন করে জানিয়ে দিয়ে, সোজা স্কুল মাঠে চলে গেল। তখন শকুন্তলার মা, এসে পৌঁছে গেছে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মুহুর্মুহু মূর্ছা যাচ্ছে সে। অন্যান্য মেয়েরা তার সেবা করছে। অর্ক সেন এসেছে শুনে তপনবাবু আবার দেখতে এসেছেন শকুন্তলাকে।

অর্ক তপনবাবুকে দেখে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তপনবাবু অযাচিত ভাবে অর্ককে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেরা গিয়েছিল আপনার বাড়িতে?

অর্ক জবাব দিল কেন?

আমি হস্টেলের ছাত্রদের যে পাঠালাম আপনাকে খবরটা দেবার জন্য।

না, কেউ তো যায়নি, তা ছাড়া হঠাৎ আপনি আমাকে খবর পাঠাতে গেলেন কেন? আপনার তো খবর পাঠানোর কথা ছিল না। আপনারা সমাজের অতীব

মান্যিগন্যি লোক। লোকে আপনাদের সম্মান করে। আমার মতো একটা বাজে ছেলেকে খবর পাঠিয়ে আপনি কিন্তু ঠিক করেননি। তা ছাড়া আপনার সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস, না করে, কেন এসব করতে যান বলুন তো?

ঠিকই বলেছেন অর্কবাবু, আপনি আমার উপর খুব খেপে আছেন বুঝতে পারছি। তবুও আজ আপনাকে আমার কথা শুনতেই হবে। যতই হোক শকুন্তলা আমার স্কুলের একজন মেধাবী বুদ্ধিমতী ছাত্রী ছিল। তার এই নির্মম হত্যাকাণ্ড আমার সবকিছুকে কেমন ওলট-পালট করে দিয়েছে। আপনি এবার আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন অর্কবাবু, যারা এইরকম একটা ফুটফুটে মেয়ের উপর শারীরিক অত্যাচার করে তাকে খুন করতে পারে, তাদের চরম শাস্তি হবার দরকার আছে।

আপনি বলছেন এই কথা, আপনার মাথাটা ঠিক আছে তো তপনবাবু?

আমার মাথাটা ঠিক ছিল না। এই শকুন্তলার মৃত্যু আমার মাথাটাকে ঠিক করে দিয়ে গেছে।

ব্যাপারটা কেমন ধোঁয়াশা লাগছে না। পরিষ্কার করে বললে খুশি হতাম। তাছাড়া রাতারাতি একটা মানুষের আমূল পরিবর্তনের পিছনে নিশ্চয় এমন কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। যা আপনি সবার কাছে গোপন করতে চাইছেন। কিন্তু তপনবাবু আপনি বোধহয় জানেন না যে, খুনি যত চালাকিই করুক না কেন, তারা কোনো না কোনো সূত্র রেখে যাবেই। অতএব পুলিশ যদিও ওদের কেনা গোলামের মতো কাজ করছে তবুও বলব খুনিরা একদিন ধরা পড়বে। তখন ময়দানে কোনো লোক থাকবে না।

সবই বুঝতে পারছি অর্কবাবু। তবে কি জানেন, এসব কাজ তো চুনোপুঁটিরা কেউ করতে সাহস পাবে না, নিশ্চয় কোনো বড়ো মাথা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

তা তো রয়েছেই। ক্ষমতাভোগীরাই এসব কাজ খুব সহজে করতে পারে। না-হলে পুলিশের ঝামেলা, কোর্টের ঝামেলাকে সামলাতে পারবে বলুন? তাছাড়া পুলিশকে দিয়ে হয়তো বা আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে বড়ো মানুষদের কোনো ঝামেলাই ভোগ করতে হবে না। সেখানে মিডিয়াদেরও কিছু করার থাকবে না।

তা যা বলেছেন অর্কবাবু। ক-দিন একটু চিৎকার চ্যাঁচামেচি হবে। দু-চার মাস পরে দেখবেন, সবাই কেমন মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। তখন তারাও পুলিশের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে। শকুন্তলা আড়ি অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। তবে আমি জেনে বুঝে আপনার কাছে একটা অনুরোধ করছি। আপনিই পারবেন এর সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে, খুনিদের খুঁজে বের করতে।

এ আপনি কি বলছেন, তা জানেন? তা ছাড়া আমি কেন আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে যাব? দেশে এখনো তো আইন কানুন আছে তো না কি?

তা যদি বলেন, আমি বলব, নেই। দেশে কোনো আইন কানুন নেই। তা যদি থাকত, আদালত বিভিন্ন হত্যা মামলায় আসামি পক্ষের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে রায় দেওয়া বারবার পিছিয়ে দিতে পারত না।

ভুল করছেন তপনবাবু, আমি বলছি, দেশে এখনো আইনের শাসন আছে আগামী দিনেও থাকবে। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে আইন বানানোর আইনি লোকগুলো থাকবে না। এ আমি শপথ করে বলতে পারি। এত সহজে হার মানলে চলবে কেন তপনবাবু, আজ শুধু একটা শকুন্তলা নয়, হাজারো হাজারো শকুন্তলাকে ক্ষমতা ভোগী কিছু হিংস্র দানবদের লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হচ্ছে।

কিন্তু এ আর কতদিন? এইভাবে চললে তো মানুষ মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। সমাজটা কিছু দুষ্ট-দানবদের হাতে চলে যাবে।

চলে যাবে কি বলছেন, বহুদিন আগেই চলে গেছে।

তা হলে উপায়?

উপায় নিশ্চয় আছে। তবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর তা পারে একমাত্র জনগণ। জণগণ যদি ইচ্ছে করে, তাহলে এসবের বিচার হবে। আর জনগণ হাতগুটিয়ে বসে থাকলে, মানুষকে দুর্ভোগ ভোগ করে যেতেই হবে।

তা হলে আর কি করা যাবে?

ওই মিউমিউ করলে হবে না। মানুষকে বোঝাতে হবে। সঠিক সত্যটাকে সঠিকভাবে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে তবেই জনগণ আলোর পথটা খুঁজে পাবে। না-হলে আজ দুলেপাড়ার ভজা দুলের মেয়ে শকুন্তলাকে মেরেছে, আগামী দিনে আপনার মেয়েকেও মারতে পারে। অতএব এইবাবে হাতগুটিয়ে বসে না থেকে পথে নামুন, প্রচার করুন। কোনো প্রতিবাদ না থাকলে, প্রতিরোধ সম্ভব নয়। আগে চাই প্রতিবাদ। এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলুন, তাহলেই দেখবেন, অন্যায়কারীরা, পিছু হঠতে শুরু করেছে। গ্রামেগঞ্জে, হাটেবাজারে, খেতে খামারে সমস্ত জায়গা থেকে প্রতিবাদে গর্জে উঠুন। তা হলে অত্যাচারীর পথের চাকাটা সেদিনই গ্রাস করতে বাধ্য। তখন দেখবেন যুদ্ধের ময়দানে শুধু সেনাপতিদের ভিড়, সৈনিক নেই। তখন অন্যের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত নয়তো বা আত্মহত্যা। এছাড়া কোনো উপায়ই ওদের কাছে পড়ে থাকবে না।

তাহলে মোদ্দা কথা হল, আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মতো করে যদি

প্রতিবাদ করি, তা হলে সাধারণ মেহনতি মানুষ বুকে এবং মনে কিছুটা হলেও বল পাবে।

নিশ্চয়ই পাবে। আপনারা যারা সমাজের উঁচুতলাতে বসে আছেন। নিশ্চিন্তে স্বর্গসুখ ভোগ করছেন, তাঁরা যদি একটুখানি প্রতিবাদে শামিল হন, তা হলে, দুলেপাড়া, বাগদীপাড়া, মুচিপাড়া, রাজবংশীপাড়া, আদিবাসীপাড়া এরা কেউ চুপ করে বসে থাকবে না। তারা আপনাদেরকে দেখে বলবে, এবার হয়তো, শংকরদাদের অত্যাচারের চাকাটা বন্ধ হলেও হতে পারে। থাক অনেক কথা বলে ফেললাম, তপনবাবু, এবার চলুন, ওই যে দেখছি পুলিশের গাড়ি আসছে, এবার লাশের কাছে যাওয়া যাক।

অর্ক সেন ও তপনবাবু দুজনেই পড়ে থাকা লাশটার কাছে গেলেন। ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে গেছে গোলপাড় থানার বড়োবাবু একে ওকে কি সব জিজ্ঞেস করছেন। অর্ককে দেখতে পেয়ে, বড়োবাবু বললেন, কি ব্যাপার মশায়, আপনার এই মধুপুরের মধ্যে এতবড়ো হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল কী করে?

অর্ক জবাবে বলল, সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব তো মহামান্য সরকার বাহাদুর আপনার কাঁধেই তুলে দিয়েছেন। তাছাড়া কি জানেন মশায়, আপনারা যদি একটু নিরপেক্ষভাবে কাজ করতেন আমার মনে হয় তা হলে অপরাধীরা অপরাধ সংগঠিত করতে ভয় পেত। আপনারা ভয়ে, ভয়ে অপরাধীদের অপরাধ করতে সাহায্য করছেন। তবে সবাই না, পুলিশের বেশির ভাগ অংশটাই এই কুকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন।

বড়োবাবু অবিনাশ ভট্টাচার্য মশায় খুব জোরের সঙ্গেই বললেন। তাদের দলে আমাকে ফেলবেন না। যদি ফেলেন তা হলে মস্ত বড়ো ভুল করবেন অর্কবাবু। দেখবেন এই কেসের ব্যাপারে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্যোগী হব। তা ছাড়া দিন দিন একটার পর একটা অপরাধ আমাদের থানায় যেভাবে ঘটে চলেছে। তাতে করে মানুষ তো নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোতে পারবে না।

ঠিক আছে স্যার আপনার কথার সঙ্গে কাজ কিন্তু মিলিয়ে দিতে হবে। না-হলে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না, বলে রাখলাম।

থাক সেটা পরে করলেও চলবে, কিন্তু আপাতত আমাদের লোকেরা যাতে করে লাশটা থানায় নিয়ে যেতে পারে, তার একটু ব্যবস্থা করে দিলে বিশেষ উপকৃত হব। আর হ্যাঁ আপনাদের বিশিষ্ট নেতাটিকে তো দেখছি না। শংকরবাবু না কি নাম যেন?

উনি এখন হয়তো সুখে নিদ্রা দিচ্ছেন। মানুষের বিপদের সময় তো ওনাদের

দেখতে পাবেন না। তবে হ্যাঁ স্যার, উনি যথাসময়ে থানায় গিয়ে আপনার সঙ্গে রফার কাজটা ঠিক সেরে আসবেন। ওখানে তিনি মোটেই ভুল করবেন না বুঝলেন?

ওনার উপর আপনার যে একবারে রাগের শেষ নেই দেখছি।

আপনারা তো ওইসব নিয়েই থাকতে পছন্দ করেন স্যার। শকুন্তলা আড়ির হত্যাকাণ্ড একদিন এই মধুপুরের মাটিতেই হয়তো চাপা পড়ে যাবে, কিন্তু, মধুপুরের মানুষ একদিন ওর হত্যাকারীকে ঠিক উপযুক্ত সাজা দেবে। আপনারা হয়তো সেদিন থাকবেন না। আমিও থাকব না, বিচার কিন্তু হবেই। যে বিচার করবে মধুপুরের জনগণ। নেতা মন্ত্রী নয়, পুলিশ প্রশাসনও নয় সেই আদালতে আপনারাও আসামি। আপনাদেরও বিচার করবে এই আদালত। নেতা মন্ত্রীরা পালিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু আপনারা কোথায় পালাবেন?

সত্যি বলেছেন অর্কবাবু, আমরা মাঝে মাঝে ভাবি, কিন্তু কি জানেন, পরে আবার সবকিছুকে ভুলে যেতে বাধ্য হই। তা ছাড়া রাজনীতিতে যদি দুর্বৃত্তদের অবাধ প্রবেশাধিকার হয় তা হলে আমরা কি করতে পারি বলুন?

তবুও ইচ্ছে করলেই আপনারা কিছুটা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করতে পারেন, কিন্তু করবেন না। ভাবুন না। একজন লেখাপড়া না জানা, অল্প জানা, লোকের হাতে আপনাদের মতো শিক্ষিত অফিসারেরা কিরকম হেনস্তা হয়ে চলেছেন। তা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের জোরে বহাল তবিয়তে তারা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যাক এসব নীতি আদর্শের কথা ছাড়ুন, এবার যে আমাকে যেতে হচ্ছে। লাশটাকে পোস্টমর্টমের জন্য কাগজপত্র তৈরি করে পাঠাতে হবে। আসছি অর্কবাবু নমস্কার।

অবিনাশ ভট্টাচার্য জিপে উঠে চলে যাবার পর তপনবাবু অর্ক সেনকে সঙ্গে নিয়ে হস্টেলে ফিরে গেলেন। পাশাপাশি গ্রাম থেকে যারা দেখতে এসেছিল তাদের ভিড়ও আস্তে আস্তে খালি হয়ে গেল। শুধু মাটিতে পড়ে রইল শকুন্তলা আড়ির শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া চাপ চাপ কালো রক্ত।

হস্টেলে পৌঁছে, তপনবাবু অর্ক সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ তা হলে স্কুল বন্ধ থাকবে?

নিশ্চয় থাকবে, শকুন্তলার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছুটি দিয়ে দেওয়াই তো কাজ। তা ছাড়া আপনারা শিক্ষক শিক্ষিকারা যাঁরা আছেন, তাঁরা শকুন্তলার বাড়ি গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই। তারপর অবিনাশ ভট্টাচার্য কি করেন দেখা যাক, না হলে তো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আপনারা মিছিল করে থানা

ঘেরাও করবেন। তা ছাড়া আপনারা আর কী-বা করতে পারেন বলুন। আর তো দেরি করা চলে না। আমি থানায় যাচ্ছি। শকুন্তলার লাশটা তো এনে দাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

কথাগুলো বলতেই বলতেই অর্ক সেন উঠে গেল। নীল নিঃশব্দে পৌঁছেই, মন্টুকে গাড়ি বের করতে বলল। ইতিমধ্যে অনেকেই নীল নিঃশব্দে এসে গিয়েছিল! তাদের সকলকেই বলল, আমরা শকুন্তলার দেহটা পোস্টমর্টেম করিয়ে নিয়ে আসব, কিন্তু তোমরা দুলেপাড়ায় গিয়ে শকুন্তলার মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করতে যাও। আর হ্যাঁ দাহ করার জন্য যা কিছু লাগবে সব জোগাড় করে নিয়ে শ্মশানে অপেক্ষা কোরো। আমরা সোজা গাড়ি নিয়ে শ্মশানে চলে যাব।

অর্ক মন্টুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল থানায় অবিনাশ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে কাগজপত্র বুঝে নিয়ে গাড়িতে লাশটাকে তুলে নিল। তারপর হাসপাতালের মর্গে গিয়ে পোস্টমর্টেম করে পাঁচটা নাগাদ ওরা ফিরে এল মধুপুর শ্মশানে, নীল নিঃশব্দের প্রায় সমস্ত সদস্যই সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। লাশটা গাড়ি থেকে নামিয়ে রাখা হল, গ্রামের নরনারী তা দেখে চোখের জলে ভাসলেন। দুলেপাড়ার প্রায় মেয়ে পুরুষ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সঙ্গে নীল নিঃশব্দের সদস্যরা, শেষে অর্ক সেন নিজেও কেঁদে ফেলল! একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ের উপর মানুষ যে এ-ধরনের অত্যাচার করতে পারে, না দেখলে তা অবিশ্বাস্য মনে হবে।

একসময়, তিয়াসা কিছু ফুল দিয়ে দেহটা প্রায় ঢেকে দিল। সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বালাতে জ্বালাতে চোখের জল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। এক সময় চিতায় তুলে দেওয়া হল শকুন্তলার দেহটাকে। তারপর সব শেষ। দু-তিন ঘন্টার মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল শকুন্তলা নামের মেয়েটা।

যে গতকালও মাথায় বিনুনি দোলাতে দোলাতে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্কুল গিয়েছিল। মুখে যার সবসময় মিষ্টিহাসি ঝরে পড়ত। বন্ধুরা যাকে হিংসে করে বলত, দুলেপাড়ার সরস্বতী। সেই মেয়েটাই আজকে সবাইকে কাঁদিয়ে, কোথায় কোন্ অজানা এক আলোর রাজ্যে চলে গেল। শুধু রেখে গেল সবার মনে এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি।

এদিকে শংকরদাকে সারাদিন বাড়ির বাইরে বেরুতে কেউ দ্যাখেনি, বাইরে প্রচার হচ্ছিল তিনি নাকি খুব অসুস্থ, বাইরে বেরুবার মতো অবস্থায় তিনি নেই। তারপর কারো কারো মুখ থেকে শোনা যেতে লাগল উনিই নাকি এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাই হয়তো ভয় পেয়ে উনি বেরোতে পারেননি।

তা যা হোক সন্ধেবেলা উনি দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে বড়ো বড়ো কথা বললেন! যে কথা হল সাতদিনের মধ্যে খুনিকে পুলিশ ধরতে না পারলে তারা দীর্ঘতর আন্দোলন গড়ে তুলবেন। প্রয়োজন হলে অনশন করবেন।

পরের দিন যথারীতি খবরটা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। অর্ক সেন সব শুনে বলল, চোরের মুখে বড়ো কথা। তা যাক তাহলে তো আর আমাদের কিছু করতে হবে না। ওনারাই যখন সব করবেন। এর থেকে সুখের কথা আর কি হতে পারে। যে লোকটা সারাদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না, সন্ধে হতেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন! এর মধ্যেও নিশ্চয়ই রহস্যের গন্ধ রয়েছে। তবে সবই তো পুলিশ করবে। তখন আমাদের আর ভেবে কি হবে।

নীল নিঃশব্দে বসে ডাক্তার অমল চৌধুরি বললেন, জানো অর্ক, আজকের দিনে নতুন জমিদাররা শুধু অর্থের মধ্যে থেমে নেই। তারাও এখন পুরোনো জমিদারদের মতো মেয়েছেলে না হলে ঘুমুতে পারেন না। অর্থ কৌলিন্যের সাথে সাথে, তারাও সত্যিকারের জমিদার হতে চাইছেন। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন যে 'পরম্পরা' বলে একটা কথা আছে। তাকে অস্বীকার করবার মতো ক্ষমতা কারোর নেই। রক্ত হচ্ছে কালো সাপের, সে বলছে, আমি শঙ্খচূড়ের জাত। কাক হয়ে ময়ূর সাজতে যাওয়াটা সবাই ধরে ফেলতে শুরু করেছে।

অর্ক সেন সব কথার ফাঁকে ৫ই সেপ্টেম্বরের কথাটা সকলকে আর এক স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলল না। সে বলল সমস্ত অভিভাবক যাতে ওই সভায় হাজির হন তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রত্যেক গ্রামপিছু দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে কাজ করতে হবে। এ-যুদ্ধে হেরে গেলে চলবে না।



অবশেষে এল সেই ৫ই সেপ্টেম্বর, দু-চারজন ছাড়া প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। প্রথমেই শকুন্তলার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েও তার আত্মার শান্তি কামনা করে সভা শুরু হয়েছিল। তিয়াসার যোগদানের ব্যাপারে কথা উঠতেই সবাই একবাক্যে তার প্রতি সমর্থন জানাল। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ একরকম বাধ্য হয়েই, সম্মত হয়ে যোগদানের অনুমতিপত্র দিয়ে দিলেন। শংকরদা আবার পিছু হঠতে বাধ্য হলেন! তপনবাবু তিয়াসাকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিলেন। শংকরদা তপনবাবুর আচরণে একটু বিস্মিতই হলেন! মনে মনে ভাবলেন যে তা

হলে কী তপনবাবু লোকটা অর্ক সেনের সঙ্গে হাত মেলালেন নাকি। ডি. আই, এস. আই ও এস. ডি. ও সাহেবরা খুব খুশি হয়েই ফিরে গেলেন।

পরের দিন যথারীতি তিয়াসা স্কুলে সময়মতো উপস্থিত হয়ে তপনবাবুর সামনে খাতায় সই করে ক্লাসে গেল। তপনবাবু তিয়াসাকে তাঁর সাধ্যমতো সহযোগিতা করলেন। সমস্ত শিক্ষকরা একটু অবাক হলেন তপনবাবুর এই পালটে যাওয়া দেখে। কেউ কেউ অবশ্য ফাঁকে বক্রোক্তি করতেও ছাড়লেন না। অবশ্য তপনবাবু কিছু মনে করেননি তাতে। তিনি মনে মনে ভাবলেন তাঁর এটাই বোধহয় পাওনা ছিল।

সন্ধেবেলা তিয়াসা নীল নিঃশব্দে এসে সকলের সামনেই তপনবাবুর প্রশংসা করল। অর্ক সব শুনে বলল। নীল নিঃশব্দ যে কিছু করছে, এটা তার একটা বড়ো উদাহরণ। না-হলে তপনবাবুর মতন দুঁদে লোক আজ এরকম আচরণ করে।

অমলবাবু বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ অর্ক, মানুষ যদি সঠিক পথে থাকে, তা হলে প্রথমের দিকে হয়তো তাকে কষ্ট পেতে হবে ঠিকই, কিন্তু শেষের দিকে তার জয় অবশ্যম্ভাবী।

নীল নিঃশব্দ এই ভাবেই এগিয়ে যেতে থাকল। অর্ক সেন বন্ধু শঙ্খ ব্যানার্জিকে ফোন করে তিয়াসার ব্যাপারটা জানাতে ভুল করল না। তারপর, পুজোর ছুটিটা যেন সে মধুপুরে এসে কাটিয়ে যায় তাও ফোনে জানিয়ে দিল।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। যথারীতি শঙ্খ ব্যানার্জি এসে হাজির হল অর্ক সেনের বাড়িতে। বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে এল নীল নিঃশব্দে। সন্ধেটা নীল নিঃশব্দের সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। শঙ্খ নিজে নীল নিঃশব্দে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছে জানাতে ভুল করল না। অবশেষে তিয়াসার সাথে নতুন করে পরিচয় ঘটল তার। বন্ধু অর্ক সেনকে সে ভালোবাসে। কিন্তু অর্ক তাকে ভালোবাসে না। সন্ধেটা নীল নিঃশব্দে কাটিয়ে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল, তারা পথে যেতে যেতে পুজো মণ্ডপ হয়ে একটু ঘুরে গেল, আজ সবে সপ্তমী, মায়ের পূজো সবে শুরু হয়েছে, তাই একটু অপেক্ষা করে পুজো দেখল, গ্রামের বউ-ঝিয়েরা কেমন লালপাড় গরদের শাড়ি পরে পুজো দেখতে এসেছে। সবার মধ্যে কেমন ভক্তি ভাবের আবেগ। শঙ্খ দেখে খুব খুশি হল মনে মনে।

মৌ এসেছিল বাবার সাথে, সে এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি অর্ককে, হঠাৎ অর্ককে দেখতে পেয়ে কাছে এসে বলল, অর্কদা, আপনি এসেছেন পুজো দেখতে?

অর্ক বলল কেন আমার কি পুজো দেখা বারণ আছে নাকি?

না অর্কদা, আমি কি তাই বললাম?

নারে, আমি তোর সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করলাম বুঝতে পারলি না, এই দ্যাখনা, ইনি আমার বন্ধু শঙ্খ ব্যানার্জি। কলকাতায় মস্ত বড়ো চাকরি করে। এ-বছর ও মধুপুরে পুজো দেখবে বলে এসেছে। তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম।

ওঃ তাই বলুন, বন্ধু না এলে যে আপনি এদিকে আসতেন না, সে কথা হলফ করে বলতে পারি আমি।

তা পারবি না। খুব তো চড়বড় করতে শিখেছিস দেখছি। তারপর তোর দাদার কি খবর বলতে পারিস?

দাদা ভালোই আছে। ট্রেনিংয়ে খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ভালো আছে।

ঠিক আছে, এবার তা হলে আমরা আসছি, বিজয়ার দিন বন্ধুকে নিয়ে তোদের বাড়ি যাব। তুই তো আমাদের খাবার জন্যে নেমতন্ন করলি না।

অবশ্যই যাবেন। আমরা কিন্তু আপনাদের পথ চেয়ে বসে থাকব বলে দিলাম।

অর্করা চলে গেল, মৌ শঙ্খকে দেখে কেমন একটু অবাক হচ্ছিল, লোকটা কেবলই তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল, মনে মনে বলল, কি জানি বাপু, লোকটা আবার বাজে লোক নয়তো। আবার বলল, অর্কদার বন্ধু কখনো বাজে হতে পারে না। মৌয়ের মনে জিজ্ঞাসা চিহ্নটা থেকেই গেল। সে আবার পুজোমণ্ডপে ফিরে গেল।

পরের দিন সকাল বেলাই অর্ক সেন বন্ধু শঙ্খকে নিয়ে শুভেন্দুদের বাড়ি গেল। সেইমাত্র মৌ বিছানা ছেড়ে উঠেছে। যদিও অনিতাদেবী ভোর ভোর উঠে সকাল বেলায় কাজগুলো সেরে ফেলেছেন। তিনিই অর্ককে আসতে দেখে, আগে ভাগেই দু-খানা চেয়ার বাড়ির উঠোনে পেতে দিলেন। অর্ক এসে না এসেই কাকিমা কাকিমা করে ডাকতে শুরু করে দিল। অনিতাদেবী বাড়ির বাইরে এসে বললেন কি ব্যাপার বলো তো বাবা, সাতসকালে চলে এলে যে? অর্ক ভনিতা না করেই বলল, জানেন কাকিমা একটা সুখবর নিয়ে এলাম।

তা কি খবরটা শুনি, তারপর না হয় সুখবরের ব্যাপ্যারটা যানা যাবে। যাই বলো বাবা, সাত সকালে যখন এসেই পড়েছ, তখন একটু চা-টা হয়ে যাক, তারপর না হয় কথা হবে। তোমরা একটু বোসো, আমি বরং তোমাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করিগে যাই।

অনিতাদেবী বাড়ির ভেতরে চলে গেলে, অর্ক মৌকে ডাকতে লাগল। মৌ সেইমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়ে কাপড় ছাড়তে ব্যস্ত। এদিকে অর্কদা ডেকেই

চলেছে। বাড়ির ভেতর থেকেই মৌ সাড়া দিল, আসছি অর্কদা একটু দেরি হবে। এদিকে শঙ্খও মৌকে দেখবে বলে মনে মনে কেমন হাঁফিয়ে উঠেছিল। শেষ মেষ চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে মৌ এসে হাজির তাদের সামনে। শঙ্খ তো মৌকে এ অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে দেখল মৌ একটা আটপউরে লালপাড় শাড়ি পরেছে জলে ভেজা চুলে, একটা গামছা জড়ানো, শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে কোমরে গোঁজা সকালের সূয্যির আলোয় মুখখানা ঝলমল করছে দেখে মনে হচ্ছে। এই মাত্র কোনো দিঘির কালো জলে সাদা কোনো পদ্মফুল, সবে পাপড়ি মেলতে শুরু করেছে সকালের আবিররঙা রোদ্দুরটা যেন সেই পাপড়িগুলোতে লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। সে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। মৌ সলজ্জ ভঙ্গিতে বাঁকা চাহনিতে কয়েক বার দেখে নিয়েছে তাকে। দুজনেই কেমন যেন অনমনা হয়ে গেছে।

অর্ক সেন অবস্থা দেখে মৌকে বলল, আচ্ছা মৌ এ-বছর তো তুই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিবি, তাই না?

হ্যাঁ অর্কদা, কিন্তু সেকথা আবার নতুন করে জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো? নিশ্চয় আপনার কোনো মতলব আছে।

দূর পাগলি! আমার আবার মতলব, এই এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি।

না গো অর্কদা, তখন মাকে বলছিলেন কি যেন একটা সুখবর নিয়ে এসেছেন?

সেই সুখবরটা কাকিমার জন্যে। তা তোকে বলবো কেন? বরং তুই ভেতরে গিয়ে একবার কাকিমাকে পাঠিয়ে দে। আঃ দেরী করছিস কেন, তাড়াতাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দেনা মৌ।

অগত্যা মৌ বাড়ির ভেতরে গিয়ে মাকে বলল, মা তুমি একটিবার বাইরে যাও, তোমায় অর্কদা তাড়াতাড়ি ডাকছেন, কি সব সুখবর রয়েছে, তোমাকে দেবার জন্যে। অনিতাদেবী বললেন, হ্যাঁ আমাকে এসে না এসেই বলছিল অর্ক। দেখি গিয়ে তার সুখবরটা কি। কিন্তু মৌ এই লুচি ক-টা ভেজে নিতে হবে যে। তুমি যাও মা, আমি ওনাদের জন্যে জলখাবার তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

অনিতা মৌকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে বাইরে বসে থাকা অর্কদের কাছে এলেন। অর্ক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বসিয়ে দিল। নিজে মোড়াটায় বসে পড়ল, অনিতাদেবীই জিজ্ঞেস করলেন, এবার তুমি বলো, কি তোমার সুখবর?

সেকথা বলব বলেই তো এসেছি। একটু বসুন স্থির হয়ে, আচ্ছা কাকিমা, কাকাবাবু বাড়ি নেই বুঝি?

না বাবা, তিনি তো পুজো মণ্ডপে গেছেন।

ও! তাইতো, ভুলেই গিয়েছিলাম। কাকিমা আপনারা ভালো পাত্র পেলে মৌয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা বলুন? আমার হাতে একটা খুব ভালো পাত্র রয়েছে—যে উচ্চশিক্ষিত, ভালো চাকরি করে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ফরসা, বংশ মর্যাদায় যে অনেক উঁচুতে। তবে আমাদের মৌয়ের কিন্তু তাকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে বলতে পারি।

সে কি, তুমি কি করে বুঝলে?

কি করে বুঝলাম বলতে গেলে অনেক কথা, তার চেয়ে বরং বলুন রাজি আছেন কিনা?

কি ছেলেমানুষি করছ অর্ক। তোমার কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস নাকরে বলি কি করে বলো তো? তা ছাড়া শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আর তুমি তো আমাদের অবস্থা জানো, টাকাপয়সার সংস্থান নেই, বিয়ে বললেই তো আর বিয়ে নয়। মৌ এবছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। তার পড়াশোনার কি হবে?

আপনি কাকাবাবুর সাথে আলোচনা করেই আমাকে বলবেন। আর শুভেন্দুর ব্যাপারে আমি দায়িত্ব নিতে পারি। আর বিয়েতে টাকাপয়সা লাগবে না। সে ব্যাপারে আপনাদের কোনো চিন্তা নেই।

ঠিক আছে অর্ক, অত করে যখন বলছ, কথা বলে দেখি, কি করা যায়।

তা হলে এবার বলি শুনুন, এই হাল আমার বন্ধু শঙ্খ। ওর সঙ্গেই মৌয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে।

ও, তাই নাকি। তুমি আগে বলবে তো। দ্যাখো দেখি ছেলের কাণ্ড। সবেতেই খালি হেঁয়ালি তোমার। তুমি দেখছি বয়সেই বড় হয়েছ, মনের দিক থেকে ছেলে মানুষই রয়ে গেছ। ঠিক আছে তোমরা একটু বসো। আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি।

অর্কদের বসতে বলে অনিতাদেবী বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। তারপর মৌকে ডেকে বললেন। একটু মিষ্টি নিয়ে আয় তো মা। অর্কদের মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছাড়া চলে না। মৌ মাকে জিজ্ঞেস করল, অতক্ষণ ধরে কী কথা হচ্ছিল মা? সে অনেক কথা, তুই আগে মিষ্টি নিয়ে আয় তারপর তোকে সব বলব। তোকে না বললে চলবে কেন, তোকে তো বলতেই হবে। অনিতাদেবী মৌয়ের হাতে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে এলেন।

অর্ক দেখতে পেয়েই অনিতাদেবীকে কাছে ডেকে বলল, কাকিমা, আজ আর সময় হবে না, এবার উঠতে হচ্ছে।

সেটি আপাতত হচ্ছে না। মৌকে মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছে অতএব মৌ ফিরে না আসা পর্যন্ত যাওয়া তোমাদের হচ্ছে না।

তাহলে মিষ্টি মুখ না করিয়ে আমার বন্ধুকে ছাড়বেন না বলছেন? ঠিক আছে। মৌ ফিরেই আসুক, তারপর না হয় ওঠা যাবে।

তোমরা ততক্ষণ না হয় একটু বসেই যাও। কি বলো? ওদিকে আমি একটু ভেতরে যাই।

অনিতাদেবী বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন, ততক্ষণে মৌ ফিরে এসেছে মিষ্টি নিয়ে। অনিতাদেবী দুটো প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে দিয়ে মৌকে ডেকে বললেন। মৌ, তুই অর্কদের মিষ্টিগুলো দিয়ে আয়। আর হ্যাঁ জল নিয়ে যেতে ভুলিসনি যেন।

মৌ তাড়াতাড়ি প্লেট দুটো নিয়ে অর্কদের কাছে গেল। অর্ক তার হাত থেকে একটি প্লেট নিয়ে নিল, মৌ আরেকটা প্লেট শঙ্খর হাতে দিয়ে বলল, মিষ্টিগুলো সব খেতে হবে কিন্তু। না খেলে ছাড়ছি না। আপনি যখন অর্কদার বন্ধু, তখন তো না বলার কোনো কারণই দেখছি না। মৌ কথাগুলো বলতে বলতে প্রায় একদৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। তারপর জলের জায়গা ও গ্লাস নিয়ে ফিরে এল তক্ষুনি। গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে মৌ শঙ্খকে জিজ্ঞেস করল আমাদের এই মধুপুর গ্রাম আপনার কেমন লাগছে?

কি করে বলি বলুন তো? সবে তো গ্রামটাকে ঘুরে দেখব বলে বেরিয়েছি। এখনো কিছুই দেখা হয়ে ওঠেনি। আগে তো ভালো করে দেখি, তারপর না হয় বলা যাবে।

যাক মন রাখা কথা বলতে বোধহয় শেখেননি, বা মন রাখা কথা বলা আপনার অভ্যেস নেই?

কেন থাকবে? আমি কিন্তু মিথ্যে কথা বলা বা শোনা দুটোই পছন্দ করি না।

আমিও না।

তা হলে ভালোই হল।

তারপর অর্ক বলল, মৌ, আজ আর নয়, এবার আমরা উঠছি। বেলা অনেক হল। বলতে বলতেই অনিতাদেবী এসে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন, আবার এসো কিন্তু বিজয়াদশমীর দিন, তোমরা আমাদের বাড়িতে দুপুরে খাবে। আজই তোমাদের নেমতন্নটা করে রাখলুম। অর্ক ও শঙ্খ খাবার আগে অনিতাদেবীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আসছি কাকিমা।

ওরা এবার মধুপুর গ্রামটার সমস্ত পাড়াগুলোকে ঘুরে দেখল। অর্ককে সবাই চেনে, কিন্তু শঙ্খকে কেউ চেনে না। তাই অনেকেই জানতে চাইছিল শঙ্খর কথা। যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছিল অর্ক, একরকম সারা গ্রামটা ঘুরতে ঘুরতে প্রায় বারোটা বাজতে যাচ্ছে। এমন সময় তারা এসে উঠল তিয়াসার বাড়িতে, তিয়াসা বাড়িতেই ছিল। হঠাৎ করে অর্ক সেন তার বাড়িতে আসবে, সে ভাবতেই পারেনি। পরি যখন তাদের বসার ঘরে বসিয়ে রেখে এসে বলল, দিদিমণি, অর্কদাদাবাবু একজন লোক নিয়ে এসেছেন। তখন তিয়াসা প্রায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে ভাবছিল, যাকে সাধাসাধি করে আনা যায়নি বাড়িতে, আজ সে নিজে এসেছে তার বাড়িতে। মনে মনে সে·আনন্দ অনুভব করল। আস্তে আস্তে সে বসার ঘরে এসে দেখল অর্ক তার বন্ধু শঙ্খকে নিয়ে এসেছে। সে হাতজোড় করে নমস্কার জানাল শঙ্খকে, শঙ্খও প্রতিনমস্কার করল।

তিয়াসাই শঙ্খকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের এই মধুপুর গ্রাম কেমন লাগছে?

সত্যি বলব, না মিথ্যে বলব?

সত্যিটাই বলবেন।

তা হলে বলি ভীষণ ভাল লাগছে। কারণ গ্রাম আমাকে ভীষণ টানে। শহরের আতিশয্য আমাকে মাঝে মাঝে ক্লান্ত করে দেয়। এখানে এসে দেখছি, মাঠভরা ধানখেত, এখানে ওখানে ফুটে থাকা কাশফুল, বিশেষ করে রাতের বাতাসে মেশা ছাতিম ফুলের গন্ধ। ভোরে শিউলির গন্ধ, ভোরের শিশির ভেজা ঘাস, আর বাঁশবনে যখন ভোরবেলা পাখিরা নানাভাবে ডাকে তখন মনে হয় সত্যি আমি বাংলার ছেলে, আমি বাঙালি আর পুজোর কথা বললে, শহরের মতন চাকচিক্য হয়তো নেই, কিন্তু আন্তরিকতা আছে ষোলো আনা।

তা হলে এক কথায় বলতে হয়, গ্রাম আপনার ভালো লেগেছে।

নিশ্চয়। এতদিন ধরে আমি যা চাইছিলাম, তাই পেয়েছি আপনাদের এই গ্রামে।

এদিকে পরি চা দিয়ে গেল, চা খেতে খেতে অর্ক বলল যাক বাবা, তুই তা হলে মধুপুর গ্রামটাকে ভালোবেসে ফেললি? তারপর তিয়াসাকে বলল, কি হল আজ কি তা হলে ডান হাতের ব্যাপারটা বাড়িতে গিয়েই সারতে হবে নাকি?

তিয়াসা তাড়াতাড়ি বলল, কেন আমি কি চলে যেতে বলেছি, যে আপনারা চলে যান। তাছাড়া শঙ্খবাবু প্রথম আমার বাড়িতে এলেন, আমি না খাইয়ে ওনাকে ছেড়ে দেব, একথা ভাবলেন কি করে?

থাক শঙ্খ, আজ তা হলে আর বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। দুপুর বেলা এখানে এসে

বেশ ভালোই হয়েছে। তবে তোর চিন্তার কোনো কারণ নেই, ভালমন্দ করে পেটটা ভরানো যাবে। তা ছাড়া অনেকদিন হল ভালো কিছু খাওয়াও জোটেনি আমার কপালে। তোর আসাতে আমারও কপালটা খুলে গেল দেখছি। তারপর কি জানিস, নতুন চাকরি পেয়েছে এখন একটু ভালো খাওয়া দাওয়া করা বা অন্যদের করানো বেশ ভালোই লাগে। কি বল শঙ্খ?

তা যা বলেছিস অর্ক। নতুন নতুন জিনিসের স্বাদই হল আলাদা।

তিয়াসা সব শুনে বলল, আমায় নিয়ে বেশ তো আজ মজা করা হচ্ছে। যার সঙ্গে একশোটা কথা বললে একটা কথা বের করা যেত না, তার মুখ থেকে রসের কথা বেরুচ্ছে। শুনে তো আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। যাক তবু মন্দের ভালো বোবারাও কথা বলতে পারে দেখে, আনন্দ হচ্ছে। তিয়াসা ওদের বসতে বলে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। পরিকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে দ্রুত ফিরে এল ওদের কাছে। তিয়াসাকে পুনরায় ফিরে আসতে দেখে অর্ক ঠাট্টার ছলে বলল, রান্নাবান্না এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল? তা হলে তো এবার খাবার জন্যে উঠতে হয়?

না মশায়, এত তাড়াতাড়ি রান্না হয়নি, তবে আমাদের জন্যে যে রান্না হয় তা হয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আপনাদের জন্য যে রান্না, তা কিন্তু একটু দেরি হবে। বলেন তো আর-এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে পারি।

না, না, আমার চায়ের ব্যবস্থা না করলেও চলবে, এখনো এমন কিছু খিদে পায়নি।

যাক আপনি তো মশায় গ্রামের লোক, শঙ্খবাবুর হয়তো খুব কষ্ট হচ্ছে। উনি মুখে কিছু বলতে পারছেন না। এরকম হলে তো উনি ফিরে গিয়ে মধুপুর গ্রামের বদনাম করে বসবেন।

না না, উনি তো আমার বন্ধু, অতএব আমি তো ভালো করে চিনি বন্ধুকে, তাই আমি দায়িত্ব নিয়েই বলতে পারি, তা উনি একেবারের জন্যও করবেন না।

থাক, তাহলে অন্তত এই অভাগির বরং মধুপুরের সম্মানটা রক্ষা পাবে।

এইভাবে নানান গল্প হচ্ছিল তিনজনে মিলে। এমন সময় পরি এসে খবর দিল, সকলের খাবার দেওয়া হয়েছে, আপনারা খাওয়াদাওয়া সেরে আবার গল্প করবেন এখন, খাবার ঘরে আসুন।

তিয়াসা প্রথমে উঠে গিয়ে দেখে নিল পরি ঠিক ঠিক ভাবে দিয়েছে কিনা। অর্ক

ও শঙ্খ খাবার টেবিলে বসেই বলল, একি করেছেন তিয়াসাদেবী। এতসব খাবার এত কম সময়ের মধ্যে হল কি করে? তা ছাড়া কি দরকার ছিল এতসব করার?

তিয়াসা বিনয়ের সঙ্গেই বলল, ওসব ভেবে লাভ নেই বরং সব খাবারগুলো কিভাবে খাবেন তাই ভাবুন আর একটি কিছু পাতে ফেলে রাখা চলবে না।

কথা না বাড়িয়ে খাওয়াদাওয়া শেষ করল ওরা, তারপর তিয়াসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্ক ও শঙ্খ নীল নিঃশব্দে ফিরে এল। তারপর চুপচাপ দু-বন্ধুতে মিলে নিজেদের ফেলে আসা জীবনের গল্প করতে লাগাল।

এদিকে তিয়াসা ওদের বিদায় জানিয়ে নিজে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল অর্কর কথা। ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, লোকটা পাগল, একটা খবর না দিয়েই হুট করে বন্ধুকে নিয়ে চলে আসাটা সে মেনে নিতে পারেনি মোটেও। কিন্তু উপায় তো কিছু নেই। অর্ক যাই করুক সে ঠিকই করেছে। এটা মেনে নিতে হবে। সে-দিক দিয়ে কোনো অভিযোগ তার নেই।

পরি এসে দেখল, দিদিমণি গভীরভাবে কি যেন ভাবছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অনুমান করছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ হয়ে যাওয়াতে সে বাধ্য হয়েই বলল দিদিমণি ও দিদিমণি বেলা যে শেষ হতে চলল, আপনি খাবেন না?

তিয়াসার যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হল, সে ঘড়ির দিকে দেখে বলল, আঃ বাব্বা, চারটে বেজে গেছে? তুই খাবার দিবি চল আমি আসছি। একসময় কোনো রকমে মুখে কিছু দিয়ে, আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। তারপর ওই একটানা অর্ককে নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে বুঝতে পারেনি।

এদিকে অর্ক ও শঙ্খ নীল নিঃশব্দে বিশ্রাম ও জীবনের গল্প সংক্ষেপে সেরে নিয়ে বাইরে পায়চারি করছিল। তার মধ্যেই সনাতন মন্টুরা এসে গিয়েছিল। তারপর সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এক এক করে সবাই নীল নিঃশব্দে পৌঁছোতে লাগল। সবার শেষে এসে পৌঁছোল তিয়াসা। অমলবাবু তিয়াসাকে দেখে বলে উঠলেন এবার কিন্তু বিজয়াদশমীটা বেশ জমজমাট হবে আমাদের মনে হচ্ছে। তিয়াসা এবার বিজয়াদশমীতে একটা ভুরিভোজের ব্যবস্থা করবে নিশ্চয়।

তিয়াসা কথাটা শুনে বলল। ডক্তারবাবু আপনি তাহলে ফর্দ করে ফেলুন আপনারা কি খাবেন। সমস্ত খরচ আমি দেব। আপনি যখন বলেই ফেললেন তখন আমিও খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। না-হলে আমাকেই প্রস্তাবটা রাখতে হত, তাহলে আমাকে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আর হ্যাঁ আমাদের বিশিষ্ট অতিথিকেও উক্ত অনুষ্ঠানে

থাকার জন্য নেমতন্ন করে রাখলাম। উনি যেন অবশ্যই দুপুরের খাওয়াটা নীল নিঃশব্দেই সারেন।

অর্ক সেন এবার বলল সবই ঠিক আছে, কিন্তু রান্নাবান্না কিভাবে হবে, কোথায় হবে, তাও ঠিক করতে হবে।

তিয়াসা নিজের থেকেই বলল, যদি কারো আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার বাড়িতেই হোক। তারপর না হয়, রান্না হয়ে গেলে খাবারদাবার বয়ে নিয়ে এলেই হবে।

অর্কই প্রতিবাদ করল। সে বলল, না তিয়াসা, নীল নিঃশব্দে ওসব খাওয়াদাওয়ার পাট নেই। তুমি খাওয়াবে যখন, তখন সবাই আমরা তোমার বাড়ি গিয়েই খাব। তবে তোমাকে এ ব্যাপারে মন্টু সনাতনরা যথাসাধ্য সাহায্য করবে। প্রয়োজনে অমলবাবু বসে থেকে সব দিক দেখভাল করবেন। জেনে রাখা ভালো, কোন ভাবেই আমি চাই না যে নীল নিঃশব্দ একটা ক্লাব পর্যায়ে নেমে যাক।

অমলবাবু সানন্দে গ্রহণ করলেন অর্কর মতামত। তিনি আরো যোগ করলেন, যে, নীল নিঃশব্দকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করুক এটা তিনিও পছন্দ করেন না।

তিয়াসা শেষমেষ বলল, ঠিক আছে, তা হলে আর দেরি না করে ফর্দটা করে আমায় আপাতত দিয়ে দিন। তারপর দেখছি কি করা যায়।

অমলবাবু একটা ফর্দ তৈরি করে তিয়াসাকে ধরিয়ে দিলেন। সে পড়ে দেখল। পাঁঠার মাংস, মাছ, দই, মিষ্টি, পাঁপড়, আইসক্রিম, পোলাও ভাত সবই রয়েছে।

বাজারের জন্যে মন্টু সনাতনকে ডেকে নেবে। সেদিনকার মতন সবাই বাড়ী ফিরে গেল। তিয়াসাকে অর্ক ও শঙ্খ তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে, পুজো মণ্ডপ ঘুরে সোজা বাড়ি ফিরে গেল। অর্করা বাড়ি ফিরতেই রঞ্জনবাবু বললেন, অর্ক তুই দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছিস। তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই। তোর বন্ধুর জন্যে কি আমাদের কোনো ভাবনা নেই? ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে সেই যে সাতসকালে বেরিয়ে গেলি বাড়ি থেকে। ফিরলি এই রাত্তির বেলা। আমরা তোকে নিয়ে আর কত ভাবি বল তো? আমার কথা না হয় নাই ভাবলি, মা-র কথাটা একটু ভাব। তা হলে অন্তত সে খুশি মনে ক-টা দিন বেঁচে থাকতে পারে। যা ভেতরে যা, তোদের জন্যে তোর মা সেই সন্ধে থেকে রান্না করে নিয়ে বসে আছে।

অর্করা বাড়ির ভেতরে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, মা যথারীতি একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন। অর্ক মায়ের কাছে গিয়ে বলল, মা খুব খিদে পেয়েছে খেতে দাও। মৈত্রীদেবী প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন ছেলের ডাকে তিনি সোজা

হয়ে বসলেন। প্রথমে ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, দ্যাখ বাছা, তুই না হয় কাজের চাপে নাই ফিরলি, তা বলে তোর বন্ধুটাকেও ফিরতে দিলি না। কাজটা তুই ঠিক করিসনি বাবা। তোরা টেবিলে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর, আমি খেতে দিচ্ছি। ওরা খাবার টেবিলে গিয়ে দুজনে মাকে নিয়েই গল্প করতে লাগল। শঙ্খ বলল, না অর্ক মাকে এভাবে কষ্ট দিস না। যতই হোক মায়ের তো বয়স হয়েছে। এই বয়সে ছেলের জন্যে এত রাত্তির পর্যন্ত বসে থাকা। আর বোধ হয় উনি পারবেন না। তুই এক কাজ কর অর্ক। এবার একটা বিয়ে করে নে। তাহলে মাসিমা অনেকটা ছুটি পাবেন।

মৈত্রীদেবী খাবার দিতে গিয়ে শঙ্খর কথা শুনে বললেন, সে কপাল কি করেছি বাবা, বুড়ো বয়সে বউমা আমাদের যত্ন করবে। তা বাপু আমাদের যত্নআত্তি নাই বা করলে, তোরা আনন্দে থাকলেই হল, তা নয় কেবল দেশ সেবা হচ্ছে। চাকরিবাকরি না করে শুধু বঙ্গে-বঙ্গে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। যাক, অতসব বলে লাভ নেই। এখন তোরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে যা। তোরা শুতে গেলে তবে তো আমি গোছগাছ করে দিয়ে মুখে কিছু দিয়ে শুতে যেতে পারব। তোরা খেতে শুরু কর, আমি তোর বিছানাটা একটু ঝেড়ে দিয়েই আসছি। কিছু দরকার পড়লে আমাকে ডাকবি কিন্তু।

মৈত্রীদেবী বিছানা ঝাড়তে চলে যাবার পর শঙ্খ বলল, দ্যাখ্ মাসিমা সত্যিই আর পারছেন না। এবার একটা সত্যিই তোর বউ নিয়ে আসা উচিত। মাসিমাকে এবার তুই বাঁচা।

তোরা আমায় কি ভাবিস বলতো? আমি মায়ের এই দুঃখটা বুঝতে পারি না। সব বুঝতে পারি, কিন্তু ....।

সেই কিন্তুটা কি জানতে পারি? অবশ্যই যদি না আপত্তি থাকে, তা হলে আমাকে বিষয়টা বলে অন্তত নিজেকে একটু হালকা করে নে।

হ্যাঁ শঙ্খ, কাউকে না কাউকে বলতে তো হবেই, যদি না বলি, তা হলে হয়তো কবে দেখবি আমি পাগল হয়ে গেছি।

ঠিক আছে আজ রাত্রে তুই আমায় সব কথা বলে নিজের বুকটা একটু হালকা করে নিবি কথা দিলি কিন্তু, মনে থাকবে তো?

নিশ্চয় থাকবে।

মৈত্রীদেবী রান্না ঘরে ঢুকে দেখলেন, ছেলেদের খাওয়া প্রায় সারা! তবুও তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন কিছু লাগবে বাবা? অর্ক সরাসরি বলল না মা, আর কিছু লাগবে না! তা হলে তোরা হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্গে যা!

অর্ক বলল না মা, আজ আমরা তোমার খাওয়া হলে তারপর শুতে যাব। তুমি খেতে বোস, আমি তোমাকে আজ খেতে দেব।

মৈত্রীদেবী বললেন, দেখছ শঙ্খ, ছেলের পাগলামি দেখেছ। ও আমায় খেতে দেবে।

ঠিক আছে মাসিমা আপনি বসুন না। দেখা যাক ও কিভাবে আপনাকে খেতে দেয়। তা ছাড়া বিয়ে থা যদি নাই করে, তাহলে তো ওকেই রান্না করে খাওয়াতে হবে তো নাকি? এখন থেকেই না হয় হাতটা একটু পাকিয়ে নিল।

মৈত্রীদেবী হাসতে হাসতে বললেন, দ্যাখ বাছা, ওসব আমার জানা আছে! ছেলেরা মা বাপকে রান্না করে খাওয়াবে আর মা হয়ে আমি তা খেতে পারব, তা হয় না বাবা! তবুও ওর যখন ইচ্ছে করছে ও আজ আমাকে খেতে দেবে, দিক না দেখাই যাক 'ও কেমন পারে।

অর্ক সত্যি সত্যিই মাকে থালা সাজিয়ে খেতে দিল। মৈত্রীদেবী তো দেখে অবাক, তিনি ভাবতেই পারেননি যে, এত সুন্দর করে সাজিয়ে খাবার দিতে হয়। কিন্তু এটা সে শিখেছে তিয়াসার কাছ থেকে। তিয়াসা এই ভাবেই খাবার সাজিয়ে তাকে খেতে দেয়। সে বলে, খেতে দেওয়াটাও একটা শিল্প। সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে কি হয়—অতিথি খাবরের থালাটা দেখে প্রথমেই মুগ্ধ হয়ে যায়, তারপর খেতে খেতে কোনো পদ যদিও একটু খারাপ লাগেও, তবুও সেটা তখন আর কাছে গৌণ হয়ে যায়!

মৈত্রীদেবী ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার এত সুন্দর করে ভাত তরকারি সাজিয়ে খেতে দেওয়া তুই শিখলি কার কাছ থেকে?

কেন, তোমার কাছ থেকে। অর্ক একটু টেনে টেনে বলল। মৈত্রীদেবী জোর দিয়ে বললেন, তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস, সত্যি কথা বল না-হলে এক্ষুনি আমি তোর বাবাকে ডাকব।

অর্ক এবার হাসতে হাসতে বলল, তোমার বউমার কাছ থেকে। কথাটা বলতে বলতেই দে ছুট। সোজা ঘরে ঢুকেই দুজনে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর শুরু হল অর্কর জীবনের নীল নিঃশব্দের কথা। শঙ্খ মন দিয়ে শুনছিল অর্ক তিয়াসার নীল নিঃশব্দের মতন ভালোবাসার কথা।

অর্ক বলছিল, যে তিয়াসা তাকে কতখানি ভালোবাসে, কিন্তু অর্ক নিজে তার ভালোবাসাকে আজ পর্যন্ত কোনোরকম মর্যাদা দেয়নি, তবু তিয়াসা তাকে ঠিক

ভালোবেসে যাচ্ছে। অথচ মেয়েটা তার জন্যে নানারকম সমস্যার মাঝখানে বার বার পড়ছে তবুও তার ভালোবাসার কোনো খামতি নেই।

সব থেকে বড়ো কথা হল শংকরদারা মাঝে মাঝেই তিয়াসাকে নিয়ে সমাজে বাজে সব অপপ্রচার করতেও ছাড়েনি। এমন কী শংকরদা কয়েকবার তিয়াসাকে কুপ্রস্তাব দিতেও কসুর করেনি।

তাকে আমি বারবার বুঝিয়েছি যে, তোমার মেয়ে সানা যখন বড়ো হবে, তখন তোমাকে আমাকে সে ঘেন্না করবে। তুমি এ পথ থেকে সরে যাও তিয়াসা। কিন্তু কে শোনে কার কথা! আমার কোনো কথাতেই সে কান দেয়নি। অথচ এই আমি তাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেও সত্যি কথাটা বলতে পারি না। হয়তো কোনদিন বলতেও পারব না মনে হয়। কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে ভাবি যে মেয়ে কিছু না পেয়েও এতখানি ভালোবাসতে পারে, তার হৃদয়টা না জানি কত বড়ো! তা ছাড়া সে আমার জন্যে প্রাণ দিতেও রাজী।

তা হলে তুই এক কাজ কর, বিয়ে করে নে।

তা হয় না শঙ্খ, আমার বাবা যদি দুঃখ পায়, তা হলে আমি যে কোনোদিন শান্তি পাব না।

আমি না হয়, মাসিমা আর মেসোমশায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি

না শঙ্খ, ওরকম ভুল তুই করিস না। সমাজ যতদূর জানে, সেটাই থাক না। জীবনে না হয় নীল নিঃশব্দের মতন দুঃখই পেয়ে গেলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যে মানুষগুলো বসে রয়েছে, তাদের জন্যে এই দুঃখটাকে মেনে না নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অর্ক সেনকে তারা যেভাবে চেনে, তাদের কাছে আমি সেই অর্ক হয়েই বেঁচে থাকতে চাই শঙ্খ। তার বেশি কিছু আমি চাই না।

তুই যখন এতদূর ভেবে রেখেছিস, তখন আমি তোর কেন ক্ষতি করতে যাব। তার চেয়ে দুঃখ করে লাভ নেই, রাত অনেক হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়।

মাঝে মাঝে ঘুমোতে পারি না। সারাটা রাত ওই জানালার সামনে চেয়ারটা নিয়ে বসে থাকি, আর অন্ধকারের আকাশটাকে দেখি। সেখানে খুঁজতে থাকি একটুখানি আলো, যে আলোয় পথটা অন্তত দেখা যাবে না, সেখানে কোটি কোটি তারা থাকতেও পথ দেখার মতন আলো পৃথিবীর বুকে ফেলতে পারে না কিন্তু একটা চাঁদের আলোয় কিন্তু অনায়াসে পথ দেখা যায়। অসংখ্য তারারা যা পারে না, সামান্য একটা চাঁদ পৃথিবীটাকে আলোয় ভরিয়ে দেয়। হয়তো একটি নক্ষত্রের

ক্ষমতার চেয়ে সামান্যতম ক্ষমতা আমাদের কাছে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তিয়াসার ভালোবাসা আমার কাছে চাঁদের নরম আলোয় ভরিয়ে দেয়। হয়তো একটি নক্ষত্রের ক্ষমতার চেয়ে সামান্যতম ক্ষমতা আমাদের কাছে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তিয়াসার ভালোবাসা আমার কাছে চাঁদের নরম আলোয় ভরা যার মধ্যে কোনো তাপ নেই। শুধুই নির্মলতা সে আমাকে পোড়ায় না অথচ ভাবায়।

না অর্ক এভাবে তুই তো একদিন পাগল হয়ে যাবি।

দেখিস শঙ্খ আমি তিয়াসার জন্যে কোনোদিন পাগল হব না। কিন্তু আমার ভয় হয়, তিয়াসা কোনোদিন যদি পাগল হয়ে যায়। তা হলে যে নীল নিঃশব্দের মতন জীবনটাও নীল নিঃশব্দ ভরে উঠবে। সেদিন হয়তো এই অর্ক সেন সত্যি সত্যিই নীল নিঃশব্দ হয়ে যাবে।

রাত প্রায় ভোর হয়ে এল, এবার তুই একটু ঘুমিয়ে নে আর আমাকেও ঘুমোতে দে।

ঠিক আছে শঙ্খ, তুই শুয়ে পড়, আমি একটু পরে শুয়ে পড়ব।

শঙ্খ একাই শুয়ে পড়ল বিছানায়। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না। কিন্তু সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে দেখল অর্ক সেই চেয়ারটায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর অর্ককে ডাকল। কী হল অর্ক, তুই সারাটা রাত এভাবে চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দিলি?

অর্ক বলল, চুপ কর শঙ্খ, দেখছিস না, ওই দুর আকাশে সে কেমন মেঘের ভেলায় চড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অর্ক এবার কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। তুই উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখে জল দিয়ে নে, একটু ভালো লাগবে। এর পর যদি না উঠিস, তাহলে আমি কিন্তু তিয়াসার কাছে যেতে বাধ্য হব।

না বন্ধু, তোকে তার কাছে যেতে হবে না, আমি উঠছি।

অর্ক সোজা বাথরুমে গিয়ে একবারে স্নান করে নতুন জামা কাপড় পরে বেরিয়ে এল। শঙ্খ তারপর বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরে বেরিয়ে এল। আজ মহাষ্টমী, মন্দিরে যেতে হবে পুষ্পাঞ্জলি দিতে তাই দেরি হয়ে গেছে।

ছেলেদের উঠতে দেরি দেখে, মৈত্রীদেবী জলখাবার তৈরি করে নিয়েছিলেন। অর্করা সোজা মায়ের সঙ্গে দেখা করে বলল, আমরা মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছি।

ওখান থেকে ফিরে আসব একটু বাদে, তারপর তোমার কাছে জলখাবার খেয়ে তবেই বের হব। কথাগুলো দ্রুত বলে দিয়েই বাইরে বেরিয়ে গেল। আজ আর সাইকেল নিল না তারা। পায়ে হেঁটেই পৌঁছে গেল পুজো মণ্ডপে, সেখানে পৌঁছেই অর্ক দেখল শংকরদা বসে আছে। তাকে দেখেই সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে দলবল নিয়ে মণ্ডপ ছেড়ে চলে গেল। অর্ক শঙ্খকে বলল চিনে রাখ্ ওই ভদ্রলোকটিকে। ওই যে ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ভদ্রলোকটি আমাকে দেখেই চলে যাচ্ছেন, উনিই হলেন সেই বিখ্যাত শংকরদা।

যিনি তিয়াসার স্কুলের সেক্রেটারি হয়ে আছেন?

হ্যাঁ উনিই সেই ভদ্রলোক। বাইরে এরা ভদ্রলোক হলেও ভেতরে ভেতরে জীবন্ত শয়তান।

গ্রামের মানুষ এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না?

নিশ্চয় করে, কিন্তু সেটা গোপনে, প্রকাশ্যে এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সাহস কেউ দেখায় না।

কেন? পুলিশ কিছু করে না? পুলিশে জানিয়ে কিছু হয় না?

না।

তারপর?

তারপর রাতের অন্ধকারে পুলিশকে সাথে নিয়ে শংকরদারা এসে বাড়ির মেয়েদের ধরে ধরে ধর্ষণ করবে। ফলে কোনো মানুষ এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস দেখায় না। ওদের উপর তলায় বারবার জানিয়েও কোনো ফল হয় না, মাঝখান থেকে বেঁচে থাকাটাই দুঃসহ হয়ে উঠে। তখন নীল নিঃশব্দে চুপ হয়ে যায় প্রতিবাদ।

ইতিমধ্যে শঙ্খ দেখতে পেয়েছে মৌকে। মৌ আজ লালপাড় একটা সাদা শাড়ি পরে তার বাবার পাশটিতে বসে রয়েছে। একসময় অর্কও দেখেছে মৌকে। শঙ্খ অর্ককে বলছে বেশি দেরি করে লাভ নেই। চল এই সময় পুষ্পাঞ্জলিটা দিয়ে দিই। অর্ক বলল তা হলে চল, তাই করি।

আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে গেল। মৌ ওদের দেখতে পেয়ে বাবাকে বলল অর্কদা এসেছে, সঙ্গে তার বন্ধুটিও। দেবেন্দ্রবাবু তাদের ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর অর্ককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সব ভালো আছ তো বাবা?

অর্ক বলল হ্যাঁ কাকাবাবু ভালোই আছি।

ঠিক আছে তোমরা বোসো হাতে ফুল নিয়ে।

তারপর পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়ে যাবার পর ওরা উঠে চলে যেতেই। মৌও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল। মৌ বলল, অর্কদা আপনারা এখনই চলে যাবেন?

অর্ক বলল, কেন বল দেখি? আমাদের কি বসতে বলেছে? হ্যাঁ অর্কদা, তিয়াসা বউদি এসে বলে গেছেন আপনাদের বসতে, তিনি না আসা পর্যন্ত বসতে হবে। এবার বুঝলেন তো ব্যাপারটা। অগত্যা বসতেই হচ্ছে, কিন্তু মৌ খিদেয় যে পেট জ্বলছে, তার কি হবে? ঠাট্টার ছলেই অর্ক বলল কথাগুলো।

মৌ আবার ফিরে গেল বাবার পাশে। একটা গাছের ছায়ায় অর্করা বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হোল না তিয়াসা এসে মণ্ডপে হাজির হল। সে এদিক ওদিকে দেখে পুজোর থালাটা বাড়িয়ে দিল মৌয়ের হাতে। মৌ তাতে হেসে ফেলল, পুষ্পাঞ্জলির শেষে থালা ভর্তি মায়ের প্রসাদ তুলে দিয়ে বলল, অর্কদাদের খুব খিদে পেয়েছে আগে গিয়ে তাদের খাইয়ে দাও, তারপর যা বলতে হয় বোলো। ওই যে গাছের ছায়ায় দু-বন্ধু মিলে গল্প করছেন।

তিয়াসা গাছের ছায়ায় এসে হাজির হল। পৌছেই সে বলল, নাও হাত বাড়াও, প্রসাদ নাও।

অর্ক বলল, ঠিক আছে দাও।

তিয়াসা প্রসাদ দিতে দিতে বলল খুব খিদে পেয়েছে তো তাই মৌ থালা ভর্তি করে আমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

জানো, মৌ ভালোই করেছে। সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল।

ঠিক আছে তোমরা খাও, আমি দিয়ে যাই। যতক্ষণ না পেট ভরছে, ততক্ষণ না বোলো না কিন্তু। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

নিশ্চয় পারো?

তোমার চোখ দুটো অত লাল হল কি করে? তা ছাড়া মুখটাও শুকিয়ে আমসি দেখাচ্ছে কি ব্যাপার বল তো? রাত্রে মনে হচ্ছে ঘুম হয়নি তোমার।

শঙ্খ বলল, এরকম করলে কারো ঘুম হয়? কেন, আমি কি করেছি? তিয়াসা হাসতে হাসতেই বলল।

কি করেছেন আপনি জানেন না?

অর্ক আর চুপ থাকতে না পেরে ধমক দিয়ে বলল শঙ্খ হচ্ছে টা কি? তুই আমাকে বাঁচতে দিবি না?

তিয়াসা কিছু বুঝতে না পেরে, ক্ষমা চাইল অর্কর কাছে। সে বলল, আমি যদি

তোমায় কথাগুলো জানতে চেয়ে কোনো অন্যায় করে থাকি, তুমি আমায় ক্ষমা করে দিয়ো। তবে একটা কথা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না, যে তুমি সারা রাত জেগে কাটিয়েছ। তা ছাড়া তুমি শঙ্খবাবুকে ধমকে চুপ করিয়ে দিলেও আমাকে তুমি চুপ করাতে পারবে না। আমি সব বুঝতে পারি, কিন্তু সব বুঝতে পেরেও আমাকে চুপ করে অপেক্ষা করতে হয়, কেন জানো? আমি যে নারী। তোমাদের সমাজ আমার হাতে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তোমাদের অনুশাসন, আমার এই মুখটাকে জোর করে কুলুপ দিয়ে রেখেছে। কিন্তু যেদিন এই শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার দরকার হবে, সেদিন তোমাদের ওই সমাজ শুধু দেখবে, কিন্তু কিছু করতে পারবে না। তুমিও আমাকে ভালোবাস অর্ক একথা তুমি মুখে না বললেও আমি জানি। কিন্তু এখনো সময় আসেনি শেকল ছেঁড়ার। তবে সেদিন বেশি দূরে নয় বুঝলে?

তুমি চুপ করবে?

কেন চুপ করব? তোমাদের ক্ষয়ে যাওয়া সমাজের ভয়ে?

না তিয়াসা না, তুমি চুপ করবে আমার জন্যে। আর আমাকে তুমি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসো বলে।

বাঃ অর্ক বাঃ। তোমার বুদ্ধির সত্যিই তারিফ করতে হয়। তোমাকে ভালোবাসি বলে সমস্ত অন্যায়কে মেনে নিয়ে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হবে?

সে কথা আমি বলিনি তিয়াসা। তুমি বুদ্ধিমতী বলেই তো সমস্ত কথা আমার বুঝতে পারো। যাক তোমার বুঝতে পারাটা তোমার কাছেই থাক না। কেন তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে নিজেকে নিজের পবিত্র ভালোবাসাকে কলঙ্কিত করছ? আজ সত্যিই আমি নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে গেলাম। তুমি কিছু মনে কোরো না তিয়াসা। পারো তো ক্ষমা করে দিয়ো।

ক্ষমা করে দেব তোমাকে? আমি আমার সারা জীবন ধরে তোমার দেওয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট বয়ে বেড়াবো তবুও তোমার মতো স্বার্থপর লোককে কোনোদিন ক্ষমা করবো না।

কেন করবে না বলো?

তুমি শুধু তোমার মান অপমানের কথাই ভাবলে অর্ক, আমার মতো দুঃখীনি নারীর কথাটা একেবারে ভুলে গেলে। যে তোমার কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারল না। যে শুধু তোমাকে একটিবার চোখে দেখার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে, যে মেয়েটা তার নিজের মান অপমানকে তুচ্ছ করে তোমার কাছে ছুটে

আসে, তার কথা যদি তুমি একটিবারও না ভাবো, মেয়েটা তোমাকে ছেড়ে বাঁচবে কি করে। কোনো নারী এভাবে জীবন কাটাতে পারে না। বিশেষ করে তোমাদের এই সমাজের মাঝখানে থেকে।

. যাক বুঝলাম তোমার কথা। কিন্তু সমাজ যে আমাদের গায়ে কাদা ছিটোবে। তখন সহ্য করতে পারবে তো?

তুমি নিজেই একদিন বুঝতে পারবে, যাদের জন্যে তুমি ভয় পাচ্ছো, সেই তারাই একদিন তোমার বিপদের দিনে মুখ ফিরিয়ে কেমন বোবা সেজে মাথা নিচু করে পালিয়ে যাবে। সেদিন তোমার ধ্যান ভাঙবে অর্ক, কারণ তুমি স্বামী বিবেকানন্দ হতে কোনোদিন পারবে না। তাঁর ছিল জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফল। তারপর ছিল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। তুমি যত চেষ্টাই করো না কেন, তুমি শংকরদাদের অপকর্ম বন্ধ করতে পারবে না। যাক যে জন্যে আমার তোমাকে অপেক্ষা করতে বলা। তা হল, তোমাকে একটা প্রণাম করা। আর মন্টু-সনাতনকে একবার আমার বাড়িতে পাঠাতে বলার জন্যে। দেখি দাঁড়াও তো একটু।

অর্ক যেই দাঁড়িয়েছে তিয়াসা গলবস্ত্র হয়ে অর্কর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, প্রতি বছর এই মহাষ্টমীর দিনে অন্তত তোমার পায়ে মাথা রাখতে পারি, এই কথাটা তুমি আমাকে দাও।

ঠিক আছে তোমায় আমি কথা দিলাম। প্রতিবছর এই মহাষ্টমীতে এই গাছের নীচে তুমি আমাকে পাবে। যদি-বা কোনো কারণে এখানে পুজো বন্ধ হয়ে যায় তবুও আমি তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করব। কিন্তু আমাদের যে অনেক দেরি হয়ে গেল, মা হয়তো এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেবেন। এখনকার মতন তাহলে আসছি আমরা। আর তুমিও মাথা ঠান্ডা করে বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমোও।

এসময় যে যার নিজের নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। অর্করা বাড়ি পৌঁছে খেয়েদেয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। অর্কর ঘুম ভাঙ্গতে একটু দেরি হল। শঙ্খ তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

সন্ধেবেলা হেঁটে হেঁটে নীল নিঃশব্দে পৌঁছোল। সবাই তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। আদিবাসীপাড়ায় নাকি বেশ কিছু লোক হঠাৎ কি এক অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। ডা. অমল চৌধুরি সেখানেই আছেন। ইতিমধ্যে কিছু ওষুধপত্রও কেনা হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, যদি বুঝতে পারি খারাপের দিকে যাচ্ছে তা হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।

অর্ক সব কথা শোনার পর মন্টুকে বলল চলতো আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবি। মন্টু সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে করে অর্কদের নিয়ে গেল আদিবাসীপাড়ায়, ওরা ওখানে পৌঁছোতেই সবাই ছুটে এল, ডা. চৌধুরি অর্ককে ডেকে বললেন, কয়েকজনকে হাসপাতালে না পাঠালেই নয়।

ঠিক আছে আপনি নামগুলো বলে দিন, আর ওদের বাড়ির লোককে তৈরি হতে বলুন, মন্টু গাড়িতে করে পৌঁছে দেবে। আর হ্যাঁ রোগীদের গাড়িতে তুলে দিতেও বলুন। স্ট্রেচারে করে তুলতে কোনো অসুবিধে হবে না।

তিনজন রোগীকে নিয়ে মন্টু হাসপাতালে গেল। তারপর অর্ক ঘুরে ঘুরে সমস্ত রোগীদের দেখল, ডাক্তারবাবু বললেন, যদি বেশি বেশি আক্রান্ত হয় তাহলে একটা মেডিক্যাল টিমের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ একটা হাসপাতালে তো এত রোগীকে রাখবার জায়গা হবে না।

আজকের রাতটা আপাতত দেখা যাক। কিন্তু ইতিমধ্যে এস. ডি. ও এবং হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে আলোচনা করে রাখা ভালো। হঠাৎ করে তো আর মেডিক্যাল টিম তারপর ওষুধপত্র পাওয়া যাবে না।

তুমি ঠিকই বলেছ অর্ক, তা হলে তুমি বরং গাড়ি নিয়ে ওই ব্যবস্থাটা করে এসো। পুজোর সময়ও খুব অসুবিধেয় পড়তে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, কাজ করে যেতে হবে।

অর্ক গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস মন্টু রোগীদের ভর্তি করে দিয়েই ফিরে এসেছিল। না-হলে গাড়িভাড়া করেই যেতে হত। অর্ক সবার সাথে আলোচনা করেই ফিরে এল। ডাক্তারবাবু অর্ককে ডেকে বললেন। মনে হচ্ছে ভয়ের কিছু নেই। তবে তৈরি থাকা মন্দ না। কি বলো?

আপনি ঠিকই বলেছেন। কারণ বলা তো যায় না যদি বিপদ আসে তাহলে তাকে তো মেনে নিতেই হবে। কিন্তু ওই শংকরদারা ঠিক ওত পেতে বসে রয়েছে। কোনোরকম একটু আধটু ভুল দেখলেই দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। এখন হয়তো বসে বসে মদের গ্লাসে তুফান তুলছেন উনি। এই হল দেশের রাজনীতি।

এখন ওসব বাদ দাও, রাত্রে এখানে কারা থাকবে ঠিক করেছ কিছু?

মন্টুকে তো থাকতেই হবে। সঙ্গে সনাতন, তারপর আপনি আমি তো রয়েইছি।

এমন সময় তিয়াসা তন্ময়কে সঙ্গে নিয়ে আদিবাসী পাড়ায় এসে হাজির। সঙ্গে চার-পাঁচ জনের খাবার। সে এসে না এসেই অমলবাবুকে বলল, রাত অনেক

হয়েছে। এবার খাওয়া-দাওয়াটা সেরে ফেলুন। আমি সবার জন্যে আলাদা খাবার নিয়ে এসেছি।

অর্কতো তিয়াসার সাহস দেখে অবাক হল। তিয়াসা আবার তাড়া লাগাল, কি হল অর্ক ওইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে লাভ নেই। পেটে তো কিছু দিতে হবে। পোড়া পেটটা তো কথা শুনবে না। ডাক্তারবাবু একটা ফাঁকা জায়গায় শতরঞ্জি পেতে বসে পড়লেন। সবাই এক-এক করে বসে পড়ল তারপর খাওয়াদাওয়ার পাঠ চুকিয়ে অর্ক মন্টুকে বলল, তুই শঙ্খকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়, ও শহুরে মানুষ, আমাদের সঙ্গে থাকলে ওর অসুবিধে হবে।

শঙ্খ নিজে থেকেই বলল, না অর্ক তুই আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিস না। তোরা পারলে, আমিও পারব। আর ঈশ্বর যখন আমাকে এনেই ফেলেছেন, তখন সুযোগটা আমি হাতছাড়া করতে চাইনে! অনেক বুঝিয়েসুঝিয়েও শঙ্খকে বাড়ি পাঠাতে পারল না!

আবার তিয়াসা বলল, আমিও থাকব তোমাদের সঙ্গে। তোমরা রাত জেগে মানুষের সেবা করবে, আর আমি ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমোবো। তা হয় না অর্ক।

অর্ক ডাক্তারবাবুকে বলল, এই-তো আপনার একজন নার্স দরকার ছিল, আপনি পেয়ে গেলেন। তা হলে আর কোনো অসুবিধেই রইল না। তবে হ্যাঁ এতগুলো লোক থাকা যাবে কোথায়। তারপর আবার মশার কামড়। একটা দুটো মশারি না হলে তো চলে না। তন্ময়ের বাড়ি সব থেকে কাছে। সবাই মিলেই তন্ময়কে, কিরে ভাই দুটো মশারি জোগাড় করে আনতে পারবি না?

তন্ময় বলল কেন পারব না। এখনই নিয়ে আসছি। তারপর দুটো মশারিতেই রাত কাটাতে হল তিয়াসা আর ডাক্তারবাবু সারাটা রাত জেগেই কাটালেন। সকাল হবার পর, অমলবাবু বললেন ভয় পাবার কোনো কারণ দেখি না। তবে মশার কামড় থেকে ওদেরকে বাঁচাতে হবে।

অর্ক বলল, ঠিক আছে, যাদের মশারি নেই, তাদের একটা নামের তালিকা করে মশারি কিনে দিলেই হবে। ডাক্তারবাবুর মত আছে তো?

আরে এই কথাটাই তোমাকে বলব বলে ভাবছিলাম। তুমি আমার মনের কথাটাই টেনে বলে দিলে। তা হলে দেরি করার কোনো কারণ নেই। প্রত্যেকে বাড়ি গিয়ে স্নানটান সেরে একটু বিশ্রাম করে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ো। ততক্ষণে আমিও বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।

মন্টু ডাক্তারবাবু ও তিয়াসাকে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছোতে গেল। এদিকে শঙ্খকে সঙ্গে নিয়ে অর্ক বাড়ি এলে মৈত্রীদেবী ছেলেদের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে নিজেকে সামলে নিলেন। তারা ঘরে ঢুকেই জামা কাপড় ছেড়ে স্নানটান সেরে, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নবমীর দিনও খুব অস্বস্তির মধ্যে কাটল সবার। দশমীর দিন যে তিয়াসার বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, তাও বাতিল হয়ে গেল।

দশমীর দিন আদিবাসীপাড়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল। নীল নিঃশব্দের ছেলেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তারা যদি সময় মতো হস্তক্ষেপ না করত তাহলে কি যে হয়ে যেত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ব্যাপারে প্রথমেই যার নাম করতে হয় তার নাম অবশ্যই ডা. অমল চৌধুরি। তাঁর চেষ্টার কোনো তুলনা হয় না। অবসর নেবার পরও তিনি মানুষের জন্যে যে এতখানি করতে পারেন তা চোখ না দেখলে বিশ্বাস করবার উপায় নেই। সবার উপরে রয়েছে অর্ক সেনের নীল নিঃশব্দ। আর্ত মানুষের সেবা করাই যার ধ্যান-জ্ঞান।

আজ শুভ বিজয়াদশমীতেও অর্ক সেন তার বন্ধু শঙ্খকে নিয়ে আদিবাসীপাড়ায় গেল। সেখানে সবার খবরাখবর নিয়ে নীল নিঃশব্দে এসে হাজির হল। নীল নিঃশব্দের যারা সক্রিয় সদস্য তারা সবাই প্রায় উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রত্যেকে প্রত্যেককে শুভবিজয়া জানাতে ভুল করল না।

তারপর শুভ বিজয়াদশমীর বিনিময়ের পাঠ চুকিয়ে অর্ক সেন শঙ্খকে নিয়ে শুভেন্দুদের বাড়ি গেল, অনিতাদেবী ও দেবেন্দ্রবাবু তাদেরকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। অর্ক ও শঙ্খ, অনিতাদেবী ও দেবেন্দ্রবাবুকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে বিদায় চাইল।

ঠিক সেইসময় মৌ এসে সকলকে প্রণাম করে বলল, অর্কদা আপনি কিন্তু আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে খাবেন কথা দিয়েছিলেন। আজ চলে যাবেন বললেই হল। দাদারা যদি এভাবে কথা দিয়ে কথা না রাখে তাহলে ছোটোরা তাদের কাছ থেকে কি শিখবে বলতে পারেন?

ঠিক আছে আমরা তোদের বাড়িতে খেয়ে তবে যাব। কিন্তু তার মাঝখানে একটা কথা, তোকে রান্না করতে হবে নিজের হাতে। অর্ক বলল মৌকে।

ঠিক আছে অর্কদা, তাই হবে।

তাহলে আমরাও উঠছি না।

মৌ প্রায় নাচতে নাচতে ভেতরে চলে গেল। দেখে মনে হল, ও বোধ হয় শঙ্খকে ভালোবেসে ফেলেছে। শঙ্খকে দেখে মনে হয়, ওরও ব্যতিক্রম নেই। থাক্ সুখের কথা দু-জন দুজনকে ভালোবাসতে পারলেই না সংসারের সুখ।

তারপর অনিতাদেবীও বাড়ির ভেতরে গেলেন। দেবেন্দ্রবাবু অনিতাদেবীর কাছ থেকে সবকথা শুনেছেন। তবুও অর্ককে জিজ্ঞেস করলেন অর্ক তুমি তোমার কাকিমাকে যা-যা বলেছ, সব সত্যি কথা তো?

হ্যাঁ কাকাবাবু। তাছাড়া শঙ্খ তো রয়েছে। আপনার কিছু জানতে ইচ্ছা করলে ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারেন।

ছিঃ ছিঃ বাবা, এ তুমি কি বলছ। তোমার উপরে আমাদের সকলের যে বিশ্বাস রয়েছে, তাকে তুমি ভাঙতে বলছ? তা হয় না বাবা। তবে শুভেন্দুকে একটা খবর দেওয়া জরুরি।

আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বিয়ে তো হবে মৌয়ের পরীক্ষার পরে, মানে মে মাসের শেষের দিকে, নয়তো বা জুন মাসে তখন তো শুভেন্দুও আসতে পারবে। আর যদি বা নাই আসতে পারে তার বিয়েবাড়ি বন্ধ হবে না, আমরা সব চালিয়ে নিতে পারব।

তোমাকেই তো সব করতে হবে।

ওসব নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। শুধু শঙ্খর মা, বাবা এসে মৌকে আর্শীবাদ করে যাবেন। আর আপনারাও একদিন গিয়ে শঙ্খকেও আশীর্বাদ করে আসবেন।

অনিতাদেবী এসে বললেন, অর্ক খাবার দেওয়া হয়েছে। তোমরা খেয়ে নেবে চলো। সবাই একসঙ্গে উঠে গেলেন। খাওয়াদাওয়া সেরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্করা বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িতে এসে দ্যাখে, মৈত্রীদেবী না খেয়ে ছেলেদের জন্যে রান্না করে নিয়ে দিব্যি বসে রয়েছেন। অর্ক তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে গিয়ে মাকে বলে মা, তুমি খেয়ে নাও, আমরা শুভেন্দুদের বাড়িতে খেয়ে এসেছি। কাকিমা আজ অনেক কিছু রান্না করে খাইয়েছেন।

তা হলে আমি যে এত রান্নাবান্না করলুম তার কি হবে?

তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি খুব কম করে খাবার দিয়ে দাও, আর সঙ্গে তুমিও বসে পড়ো আমাদের সঙ্গে, আজ একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে।

যাই ভাত বেড়ে আনি। তোরা দুটিতে বসে থাক পালাস না যেন। মৈত্রীদেবী তিনজনের ভাত তরকারি বেড়ে নিয়ে এলেন। অর্করা দেখে শুনে বেশ বিপদে পড়ে গেল। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু খাবার গলাধঃকরণ করতে হল তাদের, খেতে খেতে মাকে সব কথা খুলে বলল অর্ক। শুভেন্দুর বাড়ি তারা কেন গেছল সবকিছু।

মৈত্রীদেবী সব শুনে বললেন, তা হলে তো ভালোই হল, অভাগি মেয়েটার একটা হিল্লে হয়ে গেল। শঙ্খকে তিনি বললেন দ্যাখো শঙ্খ, মেয়েটি শুনেছি খুব ভালো, তোমার ঘরে গেলে তুমিও ধন্য হয়ে যাবে।

জানো মা, অর্ক বলল, শঙ্খ মৌকে দেখেই ভালোবেসে ফেলেছে। মৌয়েরও দেখছি শঙ্খকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে এখন থেকেই শঙ্খের খাতির যত্ন করতে লেগে গেছে।

তা ভালোই তো, ওরা দুটিতে সুখী হলে তুইও তো খুব খুশি হবি, তাই না?

হ্যাঁ মা, শুভেন্দুর অনুপস্থিতিতে আমাকেই তো সব কাজ করতে হবে। ওদের আর কে করবে বল মা?

কেন শুভেন্দুর মামারা নাকি খুব ধনীলোক। তা তারা কোনোরকম সাহায্য-টাহায্য করলে তো করতে পারে।

মাগো, গরিব বলে, কেউ তাদের খোঁজও করে না, শুভেন্দুরাও একরকম মামা বাড়ি যায়নি বললেই হয়।

সত্যি বলেছিস বাবা, টাকাকড়ি, জমিজিরেত না থাকলে, আজকাল আত্মীয়রাও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ঠিক আছে, দেখাই যাক না। কারোর সাহায্য ছাড়া আমি মৌয়ের বিয়ে দিতে পারি কিনা। শেষ পর্যন্ত নীল নিঃশব্দতো রয়েইছে। তা ছাড়া আমার তো কোনো বোন নেই। মৌ না হয় আমার বোন হয়ে গেল, কি গো মা, পারবে না মেয়ের বিয়ে দিতে?

নিশ্চয় পারব আমার যদি একটা মেয়ে থাকত তাহলে তো তার বিয়ে আমাদেরই দিতে হত। এ-না হয় তার জায়গায় শালি হয়ে গেল। তুই কিছু ভাবিস না, আমি আজই তোর বাবাকে বলে সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

অর্ক মাকে জড়িয়ে ধরে বলল এই না হলে অর্ক সেনের মা। শঙ্খ বসে বসে সব শুনছিল মা-ছেলের কথা। সব শুনে মনে মনে ভাবছিল, সত্যিই জগতে এমন মানুষ এখনো আছে তা হলে। যারা অপরকে খুশি করবার জন্যে নিয়ত ভাবে। সে এমন

ভাবে, যে জীবনে সে অর্ক সেনের মতো একজন বন্ধু পেয়েছে। যাকে নিয়ে সকলের কাছে গর্ব করা যেতে পারে। যতই দেখছে সে ততই অবাক হচ্ছে। এমন নিষ্পাপ নির্মল মনের মানুষ দুটি সে দেখেনি।

সবকিছু কথাবার্তা পাকা করে একদিন শঙ্খ মধুপুর থেকে বিদায় নিল, অর্ক, তিয়াসা, মৌ, তাকে রাস্তায় এসে বাসে তুলে দিয়ে গেল। সেদিন মৌ মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল শঙ্খ না গেলেই বোধ হয় ভালো হোত। শঙ্খকে দেখার পর থেকে কেবলই তার মনে হত শঙ্খ যেন তার কতদিনের চেনা। হয়তো জন্ম জন্মান্তরের চেনা। ও চলে যাবার পর, বুকে যেন তার কি এক অজানা ব্যথা মোচড় দিয়ে যাচ্ছিল। তবুও উপায় তো নেই। সবকিছুর জন্যে মুখ বন্ধ করে সয়ে যেতে হবে। যতই সে তার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়ে চলে যাক।

সামান্য ক-দিনের জন্যে এসে শঙ্খ মধুপুরের অনেক মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল। নীল নিঃশব্দে ফিরে তিয়াসা বলছিল, শঙ্খবাবু মানুষটা কিন্তু বেশ ভালো। সেদিন আদিবাসীপাড়ায় আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সাহায্য করে সত্যিই অবাক করে দিয়ে উনি চলে গেলেন। কেন জানি না উনি চলে যাবার পর কেবলই মনে হচ্ছে আমরা বোধ হয় ওনাকে খুব মিস করলাম, এটা আমার মনের ভুলও হতে পারে।

অর্ক সব শুনে বলল, বেশি বেশি ভালোবাসলে ওইরকম মনে হয়। ওসব কথা বাদ দাও তো, আবার যে যার কাজে মন দাও। আমাদের সামনে অনেক কাজ এখন। সামনের মাস থেকে আমাদের হাসপাতালের কাজ শুরু করতে হবে। এ-ব্যাপারে প্রশাসনিক দিকটার কথাও তো ভাবতে হবে। সমস্ত মানুষের সাহায্য আমরা পাব ঠিকই কিন্তু সব থেকে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে শংকরদারা। তবুও আমরা সবদিক সামলে নিতে পারব, এই ভরসা বা মনোবল আমাদের আছে।

ডাক্তারবাবুকে নিয়ে একদিন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। ডাক্তারবাবুর খুবই পরিচিত মানুষ উনি। আশা করতে পারি উনি আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তা ছাড়া উনি তো আমাদের জেলারই মানুষ। উনি খুবই ভালো মানুষ। আমাদের এই শংকরদাদের থেকে অনেক আলাদা।

তবুও দলের কথা না মেনে তো উনি কিছু করতে পারবেন না? অমলবাবু বললেন আগে ওনার কাছে পৌঁছে দেখি তো, তারপর না হয় অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করা যাবে। তা ছাড়া আমরা নীল নঃশব্দ থেকে বাড়ি করে দেব। শুধু ওনারা অনুমোদন দেবেন।

যথারীতি একদিন অর্ক, মন্টু ও অমলবাবু মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মন্ত্রীমশায় অমলবাবুকে দেখেই চিনতে পারলেন। তারপর কুশল বিনিময় হবার পর তিনি বললেন, বলুন আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি?

অমলবাবুই বললেন সব। আর অর্কর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই হল অর্ক সেন। ও একটা মধুপুর গ্রামে সেবাসংস্থা খুলেছে। যার নাম দিয়েছে নীল নিঃশব্দ। ওখান থেকে সমাজের নানান সব সেবামূলক কাজ করে থাকে। স্থানীয় প্রশাসনের স্বীকৃতিও পেয়েছে। মাঝে মাঝে মিডিয়ার মাধ্যমে ওর সব প্রশংসনীয় কাজকে তুলে ধরা হয়েছে। এত কথা বলার দরকার ছিল না। কারণ আপনার কাছে অর্কই আসবে দরকার পড়লে।

আমরা মধুপুর গ্রামে একটা হাসপাতাল করতে চাই। তার বাড়ি থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমরা করব। কিন্তু আপনাকে অনুমোদনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

এত ভালো প্রস্তাব নিয়ে খুব কম লোকই এসেছে আমার কাছে। যারা আসে, তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কেউ এইরকম জনসেবার কথা বলেন না। যাক আপনি এখন যান। দরখাস্তটা রেখে যান, আমি আপনার হাসপাতালের কথা নিয়ে ভাবব।

অমলবাবু বললেন, হাসপাতাল, উদ্‌বোধন করতে আপনাকেই যেতে হবে। সবকিছু হয়ে গেলে, অর্ক এসে তারিখটা পাকা করে যাবে। আজ তা হলে উঠি, নমস্কার।

ওঁরা সময়মত খাওয়াদাওয়া সেরে মধুপুরে ফিরে এলেন। ফিরতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। তারপর আবার নীল নিঃশব্দে বসে সমস্ত কাজের প্ল্যান প্রোগাম সাজাতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। অমলবাবু বললেন, তা হলে এমন একজন কন্ট্রাকটরকে কাজটা দেওয়া হোক যে পূর্বে কোনো হাসপাতাল তৈরি করেছে। যার এ ব্যাপারে ভালো রকমের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

অর্ক বলল, নিশ্চয়, অভিজ্ঞতা ছাড়া কাজ দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া সময় মতো সে কাজ শেষ করতে পারবে কিনা সেই বিষয়টাও তো খতিয়ে দেখতে হবে। তা হলে কাল থেকেই সেই লোকের খোঁজ নেওয়া শুরু হয়ে যাক। আর একটা কাজ করলে হয়, কাগজে একটা অ্যাড দিয়ে দিলে সুবিধে হয়।

অমলবাবু বললেন ঠিক আছে, তাই করো। তবে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। একদম দেরি করা যাবে না।

আর আজকের মতো তা হলে ওঠা যাক কি বলো অর্ক?

হ্যাঁ আপনি আসতে পারেন। মন্টুকে ডেকে অর্ক বলল, অমলবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আয়।

তিয়াসা এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিল। ওরা চলে যাবার পর বলল, জানো অর্ক, আগামী কাল একবার ডি. আই অফিসে যেতে হবে। তপনবাবু বলছিলেন আপনাকে নিজে গিয়ে কিসব কাগজপত্র জমা দিয়ে আসতে হবে।

ঠিক আছে কাল যাওয়া হবে। তুমি তৈরি হয়ে নীল নিঃশব্দে চলে আসবে। আমি এখানেই অপেক্ষা করব।

তুমি কি হোটেলে খাবে? না হলে আমি বলছিলাম তোমার খাবারটা আমি কৌটোয় ভরে ব্যাগে দিয়ে দেব। তুমি যেখানে পারবে, খেয়ে নেবে।

না, তিয়াসা আমি বরং হোটলেই খেয়ে নেব।

ঠিক আছে। তোমার যা ভালো মনে হয় কোরো, আমি তা হলে উঠছি।

একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়েই বাড়ি চলে যাব।

অর্ক টেবিলটা ভালো করে গুছিয়ে রেখে বলল চলো এবার। সনাতন, মন্টু তোমরা তালা বন্ধ করে বাড়ি চলে যাও। রাস্তায় যেতে যেতে তিয়াসা বলল আচ্ছা কি করলে তুমি আমার উপর সদয় হবে বলো তো?

কেন তোমার কি মনে হচ্ছে। আমি তোমার উপর সদয় হইনি।

আমার মনে হয় তুমি গা বাঁচানোর জন্যেই আমার কাছ থেকে দুরে দুরে থাকছ। পাছে তোমার সম্মানহানি হয় তার জন্যেই আমার কাছ থেকে দুরে দুরে থাকছ। মাঝে মাঝে তুমি এমন ভাব দেখাও, যে তুমি বোধ হয় আমাকে চেনোই না।

এটা কি তুমি ঠিক করো? তুমি তো জানো, তোমার ব্যবহারে মনে মনে কতখানি আমি আঘাত পেতে পারি।

সব জানি তিয়াসা, কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই, তুমি এইটুকু কেন বুঝতে পারো না, যেটা আমাকে করতে হয়, সেটা একরকম বাধ্য হয়ে করতে হয়।

সব বুঝলাম, কিন্তু কোনোদিন যদি এমন পরিস্থিতি হয়, যেদিন তুমি বাধ্য হবে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে। তখন কি করবে?

সেদিনের কথা সেদিন ভাবা যাবে।

ঠিক আছে, সেদিনটির জন্যেই অপেক্ষা করে বসে থাকব। আমরা পৌঁছে গেছি অর্ক, এবার তুমি আসতে পারো।

তুমি আগে বাড়ির ভেতরে ঢোকো, তারপর আমি যাব এখান থেকে।

দরজায় টোকা দিতেই পরি এসে দরজা খুলে দিল। তিয়াসা ভেতরে ঢুকতেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ পেয়ে অর্ক সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের দিন তিয়াসা সমস্ত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ নীল নিঃশব্দে এসে পৌঁছোল। অর্ক তার আসার পথ চেয়েই বসেছিল। তিয়াসা আসতেই অর্ক সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তিয়াসা পেছনের ক্যারিয়ারে বসল গিয়ে।

তারপর কানপুরে সাইকেল রেখে একটা বাসে চেপে বসল মেদিনীপুর পৌঁছাতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর বাস থেকে নেমে সোজা ডি. আই অফিসে গেল। ডি. আই সাহেব অর্ককে দেখেই বসতে বললেন এবং সমস্ত রকম কুশল বিনিময় করলেন।

অর্ক তিয়াসার ফাইল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, স্যার, একটু দেখুন। ডি. আই. ফাইলটা দেখে নিলেন ভালো করে। তারপর বললেন ঘণ্টা খানেক পরে আসুন অর্কবাবু। আমি সব রেডি করে রাখছি।

অর্করা নমস্কার জানিয়ে নীচে নেমে এল। তারপর একটা সাধারণ হোটেলে উঠে খাবার অর্ডার দিল একটা। তিয়াসা শুনে বলল, কি হোল তুমি একাই খাবে? আমি কি উপোস করে থাকব নাকি?

তার মানে তুমি খেয়ে আসোনি?

কি করে খেয়ে আসি বলো, তুমি না খেয়ে, আসবে আর আমি খেয়ে আসব, এতটা অধঃপতন আমার ঘটেনি।

হোটেলবয়কে অর্ক ডেকে আর-একটা খাবারের অর্ডার দিল। তিয়াসা জিজ্ঞেস করল, কি খাবে বলো? মাছ না মাংস?

তুমি কি খেতে পছন্দ করো?

তাহলে দুটো মাছ ভাত দিতে বলো। আমি তোমার সাথে অনেকদিন পরে মাছ খাব।

হঠাৎ মাছ খাবার সখ কেন?

সে তুমি বুঝবে না। তোমরা পুরুষরা বুঝতে চাও না।

না, তা নয় এতদিন খাওনি তো তাই বলা। আমার কথায় কিছু মনে কোরো না।

তুমি আজ গালাগাল দিলেও আমি কিছু মনে করব না তবে ফিরে গিয়ে হয়তো করতে পারি।

খেয়ে দেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে একটু ডি. আই অফিসের নিচে অপেক্ষা করে। প্রায় দেড় ঘন্টা পরে আবার ডি. আইয়ের কাছে গেল। ডি. আই সাহেব সমস্ত কাজগপত্র তৈরি করেই রেখেছিলেন। অর্কর হাতে দিয়ে বললেন, তা হলে এবার তো মিষ্টি খাওয়াতে হয়। অর্ক তিয়াসাকে বসতে বলে নীচ থেকে রাজভোগ নিয়ে গিয়ে টেবিলে রেখে বলল, ধন্যবাদ-নমস্কার। আমরা এখন আসছি তা হলে।

অর্ক কথাগুলো বলে দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে দুজনে নীচে নেমে এল, তখন বেলা চারটে পেরিয়ে গেছে। তারপর রিক্সা ধরে বাসস্ট্যান্ডে যখন এসে পৌঁছোল, তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। তারা যে গাড়িতে চেপে বসল সাড়ে পাঁচটায় ছাড়বে। বাসে বসে বসে অর্ক ভাবতে লাগল আজও ফিরতে রাত্রি হয়ে যাবে। জানিনে আজ আবার ভাগ্যে কি রয়েছে। যা হোক কোনো রকম করে বাসে বসে সময়টা কেটে গেল। কিন্তু অক্টোবর মাসের সূর্যতো একটু তাড়াতাড়ি অস্ত চলে গেল। গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। গাড়ির ভেতরের আলোগুলো কেমন মিটিমিট করে জ্বলছিল। তিয়াসা মাঝে মাঝে অর্ককে চিমটি কাটছিল। অর্ক বাধ্য ছেলের মতো চুপ করে বসে সব সহ্য করছিল।

তিয়াসা এমন উপদ্রব শুরু করল, অর্ক আর চুপ থাকতে না পেরে সে বলল, তিয়াসা, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো? তুমি যেন আজ খুব সাহসী হয়ে গেছ?

সাহসী না হয়ে উপায় কি বলো? তুমি যখন নিজের থেকে কথা বলবে না। তখন বাধ্য করা হল কথা বলতে। তুমিই বলো সারা রাস্তাটা চুপচাপ বসে থাকা যায়?

বসে থাকতে না পারো, ঘুমিয়ে পড়ো।

তা হলে এক কাজ করি, তোমার বুকে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

বারে, লোকে দেখে বলবে কি?

লোকে কি বলল, তাতে আমাদের কি বলো তো?

তা হয় না তিয়াসা, লোকই তো সব। লোক নিয়েই তো সমাজ, লোকে কি

বলল তা নিয়েই তো সমাজ চলে। আর আমরা এত নিচে নামিনি, যে বাসের মধ্যেই এতখানি কাছে আসতে হবে।

ঠিক আছে, তা হলে অন্তত কথা বলো, যাতে সময়টা কাটে। তুমি আমার মনের মানুষ হয়ে পাশে চুপ করে এসে থাকবে, আমি কিন্তু তা মোটেই সহ্য করতে পারব না।

দ্যাখো তিয়াসা, তুমি জানো মৌয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?

কি করে জানব বলো, আমাকে তুমি বলেছিলে?

মৌয়ের বিয়ে হবে আমার বন্ধু শঙ্খের সঙ্গে, কি ভালো হবে না।

খুব ভালো হবে। তাই সেদিন মুখপুড়িটা মুখ গোমড়া করেছিল, কিন্তু শুভেন্দুতো তখনো আসতে পারবে না, তা হলে?

কেন, আমরা পারব না বোনের বিয়েটা দিতে?

নিশ্চয় পারব, তবে আমাদের বিয়েটার কথাও এবার ভাবলে হত না?

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কি যাতা বলছ?

আমি রূঢ় সত্যিটাই বলছি। তুমি মানতে না পারো, কিন্তু আমার মন যা চাইছে তাই বলে ফেললাম। তাতে তুমি আমাকে হ্যাংলা ভাবতে পারো। আর সত্যিই তো তোমাকে আমি স্বামী হিসেবে চাই। তা ছাড়া বহুদিন আগে থেকেই তোমাকে স্বামী হিসেবে পুজো করে আসছি। মনে পড়ে অষ্টমীর দিন কেন তোমাকে দিয়ে শপথ করিয়েছিলাম। কারণ যদি তুমি সারাজীবন স্ত্রীর মর্যাদা না দাও, তাহলে ওই একটা দিন অন্তত মায়ের কাছে পুজো দিয়ে তোমাকে খাইয়ে প্রণাম করে আমি স্ত্রীধর্মের আচারটা পালন করবার সুযোগ পাব। সেদিন তুমি হয়তো না জেনেই শপথ করে ফেলেছ। আজ সেই মনের কথাটা বলে ফেলাম।

দ্যাখো তিয়াসা, তোমাকে যখন কথা দিয়েছি, তখন কথার অবমাননা আমি কোনোদিন করব না।

তা হলে আমি কোনো ভুল করিনি বলো?

নিশ্চয় না।

তাহলে তোমার এত সংকোচ কেন? কেন তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে, তার সঙ্গে আমাকেও?

ওসব তুমি বুঝবে না। আর আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব না। এটুকু জেনে রাখো, সব কেন-র উত্তর হয় না।

তাহলে তুমি তোমার কাজ নিয়ে পড়ে থাকবে। আর আমি দিনরাত তোমার কথা ভেবে ভেবে নিজেকে পুড়িয়ে মারব। তবে বলে রাখি অর্ক ভগবান যদি কোনোদিন দেন তা হলে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব যে তোমার তিয়াসা তোমাদের কারোর চেয়ে কম যায় না।

সব বাদ দিয়ে এখন ভাবো, কি করে এতটা রাস্তা যাওয়া যাবে। শংকরদার লোকেরা যদি চক্রান্ত করে আমাদের কোনো বিপদে ফ্যালে, তা হলে তো হয়েই গেল তোমার আশাটা অন্তত পূর্ণ হবে।

তুমি কি আমাকে এতখানি নীচ ভাবো অর্ক?

না তিয়াসা, আমি ঠাট্টা করলাম।

তাই বলো, না-হলে এখনই বিপদ ঘটিয়ে দিতাম।

চলো আমাদের নামতে হবে। আমরা কানপুরে এসে গেছি।

কানপুরে এসে বাস থামতেই ওরা দুজন বাস থেকে নেমে পড়ল। অর্ক আলোর কাছাকাছি গিয়ে ঘড়িটা দেখে বলল রাত ন-টা বেজে গেছে। তবে আকাশে তখন চাঁদের আলো ঝলমল করছে। পরিবেশটা বেশ মন মুগ্ধকর। এই চাঁদের আলোয় অবগাহন স্নান করতে করতে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে যেতে কার না ভালো লাগে।

রাস্তার দু-ধারে গাছপালা আর মাঠভরা কিসের খেত দেখতে দেখতে বেশ লাগছিল ওদের, তার উপর মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসা, ছাতিম ফুলের গন্ধ মাথার উপরে হেঁটে যাওয়া চাঁদ, নক্ষত্র, এইরকম মনোরম পরিবেশটা সবে উপভোগ করতে শুরু হয়েছে। এমন সময় হঠাৎই একদল লোক এসে, মুখগুলো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলল, তারপর জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিল। অর্ক লোকগুলোর মুখে কাপড় বাঁধা থাকায় কাউকেই চিনতে পারল না।

এদিকে নীল নিঃশব্দের ছেলেরা সব কানপুর পর্যন্ত খোঁজ করতে এগিয়ে গেল। তারপর তারা ফেরার পথে দেখল অর্কর সাইকেলটা পড়ে রয়েছে। সনাতন, মন্টু সাইকেলটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি নীল নিঃশব্দে ফিরে এসে ডাঃ অমল চৌধুরিকে বলল সব কথা। অমলবাবু মন্টুকে গাড়ি বের করতে বলল। অমলবাবু প্রথমে রঞ্জনবাবুকে খবরটা দিলেন। তারপর তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি

লেখালেন যে ঘটনাটা কিছুক্ষণ আগে ঘটেছে। পুলিশ যদি এ ব্যাপারে একটু উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের খুঁজে বের করা সহজ হয়ে যাবে।

বড়োবাবু বললেন, ডাক্তারবাবু আপনারা এগোন, আমরা ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি। অমলবাবু ও রঞ্জনবাবু বিষয়টা এস. ডি. ও-কে জানানো দরকার মনে করে তিনি নীল নিঃশব্দে থেকে গিয়ে রঞ্জনবাবুকে পাঠালেন তাঁর কাছে। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেল রঞ্জনবাবু। তখনও থানার কোনো পুলিশ আসেনি। মনে মনে ভাবছেন এই হচ্ছে আমাদের পুলিশ প্রশাসন। এরা নাকি মানুষের রক্ষাকর্তা।

সারা রাত প্রায় কাটার মুখে থানার বড়োবাবু সহ একদল পুলিশ এসে হাজির হল তাদের মুখ থেকে তাজা মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। কেউ কেউ গাড়ি থেকে নামতেই পারছে না। তারা খুঁজে বের করবে অর্কদের। নীল নিঃশব্দের সবাই জানে এ কাজ কে বা করা করেছে। তবুও প্রমাণ না পেলে হাতেনাতে ধরতে না পারলে কিছুই তো করার থাকবে না।

সকাল পর্যন্ত পুলিশ খানাতল্লাশি করে বের করল অর্কদের। তারা খবর পেয়ে একটা ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ অবস্থায় অর্কদের আবিষ্কার করল।

ওখানকার লোকজন সব বলল কাল রাতেরবেলা নাকি ওরা কোথায় দুজনে একটু ফষ্টিনষ্টি করছিল। তাই দেখে ছেলেরা সব ধরে ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে রেখেছে। আজ ছেলেরা সব পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেবে বলে ছেলেরা প্রধান সাহেবের কাছে গেছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন সবাই এসে পড়ল বলে।

বড়োবাবুর মুখ দেখে এবং তার কার্যক্রম দেখে অনুমান, যে উনিও বিষয়টা জানেন। পুলিশ পাড়ার লোকজন সব অপেক্ষা করতে লাগল প্রধান সাহেব আসার জন্যে।

দেখতে দেখতে প্রধানবাবু উপস্থিত হলেন সঙ্গে সেই বিখ্যাত জননেতা শংকরদা। ওনারা এসেই নানান সব কুমন্তব্য করতে লাগলেন।

ওদিকে অর্ক তিয়াসা সারা রাত অন্ধকার একটা ঘরের মধ্যে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিল। কখনো কখনো মৃত্যু ভয়ও তাদেরকে কাবু করছিল। তিয়াসা অর্ককে বারবার একটা কথাই বলেছিল ওরা খুন করবে বলে আমাদের ধরে আনেনি। ওরা তোমাকে জনগণের কাছে ছোটো করবে বলেই ধরে এসেছে। আর সত্যিই যদি আমাদের খুন করে তাহলে তো ভালোই হবে। মানুষ বলবে একাজ শংকরদা ছাড়া কেউ করেনি। গরিব মানুষরাই ওদের শায়েস্তা করে দেবে।

তিয়াসা বলেছিল অর্ক, তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে ওরা তোমার উপর মানসিক অত্যাচার করবে। তোমার কাছে আমার একটিই অনুরোধ ভয় পেয়ো না। তারপর আমি আছি যা বলার আমি বলব। অন্যায় যখন কিছু করিনি তখন ভয় পাব কেন। আজ না হোক একদিন সত্যি প্রকাশ পাবেই, সেদিন এই অপকর্মের কথা চাপা থাকবে না। আজ যে জনগণ ল৭ ার মাথা হেঁট করে ফিরে যাবে তারাই মাথা উঁচু করে ওইসব শয়তানদের বিচার করবে।

পুলিশ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে জনগণের সামনে বিচার সভা ডেকে অর্ক সেন ও তিয়াসা সমাদ্দারের বিচারের রায় ঘোষণা করলেন স্থানীয় জননেতা মাননীয় শংকর বাগ। বলা হল এই ঘৃণ্যতম কাজে আসামিরা লিপ্ত থাকায়, ওদের মাথা ন্যাড়া করে সভায় ঘোরানো হোক আর সমাজের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, বা গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েদের উপর ওদের কোনো কুপ্রভাব না পড়ে, তার জন্য ওদেরকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। অনেক মানুষ সভার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন আসামিদের কাছ থেকে কোনো কথা না শুনেই একপাক্ষিক এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে এই শাস্তি ঘোষণাকে আমরা মানি না। সভার মানুষজন যখন চিৎকার চ্যাঁচামেচি করতে শুরু করেছে তখন থানার বড়োবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে আপনারা কি চান?

বেশির ভাগ মানুষই বললেন ওনাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কারণ ওদের মধ্যে কোনো খারাপ সম্পর্ক থাকত তা হলে ওদের মেদিনীপুর শহরে লজের অভাব হত না। তা ছাড়া তিয়াসা সমাদ্দারের বাড়িই তো সব থেকে ভালো জায়গা। মিছিমিছি মান সম্মানের কথা ভুলে তারা এই অপকর্ম করেছেন এ-কথা বিশ্বাস যোগ্য তো নয়ই, বরং এর মাঝখানে কারো চক্রান্ত কাজ করেছ। আপনি এই সম্মানীয় ও সম্মানীয়াকে এভাবে সভা ডেকে অপমান করছেন অন্যায় ভাবে, এও কি আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া আসামিদের মধ্যে একজন শিক্ষিকা, আর-একজন বিখ্যাত সমাজসেবী। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ আজ এই বিচারকে বাতিল ঘোষণা করেছে।

আদিবাসী, দুলে বাগদিরা বুদ্ধিজীবীরা সবাই এক জোট হয়ে প্রতিবাদ করাতে বড়োবাবু সভা বাতিল বলে দিয়ে কেটে পড়লেন। শংকরদাও কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

তারপর অমলবাবু পঞ্চায়েত, পুলিশ ও শংকরদার বিরূদ্ধে কোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। শুধু তাই নয় তিনি 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'র কাছেও একটা অভিযোগ জানিয়ে রাখলেন।

অমলবাবু তার মাঝখানে হাসপাতালের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অর্ক কিছু দিন মুষড়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন যাবার পর আবার কাজ করতে লেগেছে।

অমলবাবুও হাসপাতালের সব দায় দায়িত্ব অর্কর উপর দিয়ে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার মাঝখানে ঘটে গেল এক মস্ত বড়ো দুর্ঘটনা। যে দুর্ঘটনা সকলকে একটা বড়ো ধরনের ধাক্কা দিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে ফোন এল যে, শঙ্খ ব্যানার্জির খুব শরীর খারাপ, তাকে একটা প্রাইভেট হাসপাতলে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। ফোনটা রিসিভ করেছিল অর্ক নিজে। অর্ক কাউকে কিছু না বলে সোজা অমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে গেল। অর্করা পৌঁছোবার আগেই শঙ্খ তাদের মায়া কাটিয়ে ইহলোক ছেড়ে অজানা এক লোকে পাড়ি দিয়েছে।

অর্ক শঙ্খর মৃতদেহ দেখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু অমলবাবু এই বয়সেও নিজেকে ঠিক রেখেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন অর্কর উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অতএব অর্ককে এখান থেকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সে কি যেতে চাইবে? শঙ্খর আত্মীয়স্বজন বাবা, মা সকলেই কলকাতাতে শেষকৃত্য করতে রাজি হয়ে গেলেন। শেষকৃত্যটা খুব তাড়াতাড়ি সারা হয়ে গেল। এবার তো বাড়ি ফেরার পালা। অমলবাবু অর্ককে বুঝিয়েসুঝিয়ে গাড়িতে তুললেন। কিন্তু তার কান্না থামানো বেশ মুশকিল হয়ে উঠল। অমলবাবু কোনোরকম করে ওষুধপত্র খাইয়ে, নীল নিঃশব্দে এসে পৌঁছোলেন। তখনও শুভেন্দুদের বাড়িতে খবরটা দেওয়া হয়নি। অর্কর যখনই জ্ঞান ফিরে আসছে তখনই সে বলছে মৌকে আমি কি করে মুখ দেখাব? মৌয়ের সামনে আমি কি করে দাঁড়াব?

শুধু অমলবাবু নয়, সবাই ভীষণ ব্যথা অনুভব করেছিল শঙ্খর আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরে। কিন্তু মৌ আর অর্ক দুঃখ পেয়েছিল বেশি। যখন তিয়াসা শঙ্খর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল, তখন মুখার্জি বাড়িতে কি ঘটনা ঘটেছিল। অনিতাদেবী যদিও সামলে নিলেন, মৌ আজ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেনি। এখনও সে সাদা কাপড় পরে, এখন সেও একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করে তবুও শঙ্খকে সে আজও মনে মনে স্বামী হিসেবে মানে।

একদিকে, তিয়াসার অবস্থা একরকম, আবার অন্যদিকে মৌয়ের অবস্থা

একরকম। একজন স্বামী মারা যাবার পর অন্য একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চায় আরেকজন বিয়ের আগেই স্বামীর মৃত্যুর শোককে মনে মনে বয়ে বেড়াচ্ছে।

এতএব সমাজে সবাই আছে থাকবে। সকলকে নিয়েই সমাজ চলছে চলবে।

এদিকে হাসপাতালের ঘরবাড়ি সব তৈরি হয়ে যাবার পর, এবার হাসপাতাল চালু করার ব্যাপারে, অমলবাবু আবার একদিন গাড়িতে করে অর্ককে সঙ্গে করে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কলকাতায়। অমল চৌধুরি মন্ত্রীমশায়ের সাথে আলোচনা করে উদ্‌বোধনের দিন পাকা করে মধুপুরে ফিরে এলেন।

এবার তো শুধু সরকারি অনুমোদনের ব্যাপার, মন্ত্রীমশাই বলেছেন ওটা উদ্‌বোধনের দিন জানিয়ে দেবেন। অমলবাবু ফিরে এসে বললেন, আগামী ৩রা বৈশাখ আমাদের হাসপাতাল উদ্‌বোধন হবে। উদ্‌বোধন করতে আসছেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে।

৩রা বৈশাখ হাসপাতাল উদ্‌বোধন হয়ে গেল। হাসপাতালের নাম রাখা হল নীল নিঃশব্দ। মন্ত্রীমশায় বলে গেলেন খুব শিগ্‌গির আমরা সরকারি অনুমোদন দিয়ে দেব। যেহেতু পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো গ্রামীণ হাসপাতাল নেই।

এদিকে হাসপাতালের কাজ চুকে যাওয়ার পর ডাক্তার অমল চৌধুরি নিজেই রোগীদের দেখছিলেন। কিন্তু কাগজে ডাক্তার এবং নার্স চাই বলে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল অর্ক সেন, নীল নিঃশব্দ হাসপাতালের পক্ষে। তাতে লেখা ছিল কোনোরকম পারিশ্রমিক না নিয়ে যদি কোনো সহৃদয় ডাক্তার বা নার্স সত্যিকারের আর্ত মানুষের সেবা করতে চান, তাহলে আপনি আমাদের নীল নিঃশব্দ হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করুন। থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেবে। নীচে ঠিকানা— গ্রাম মধুপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দেখতে দেখতে হাসপাতালে চারজন ডাক্তার, তিনজন নার্স কাজে যোগদান করেছে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারি সাহায্যে নীল নিঃশব্দ দিন দিন বাড়তে লাগল। সমস্ত রোগীর চিকিৎসা খুব যত্ন করে করতে লাগলেন।

এদিকে কোর্টের নির্দেশে পুলিশ তখনকার সময়ে দায়িত্বে থাকা বড়োবাবুকে ও শংকরদা প্রধান সাহেবকে অ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ কিন্তু এ. পি. ডি. আর-এর ভূমিকা, তারা অভিযোগ পেয়েই নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দেখে, আবিষ্কার করেছিল, যারা শংকরদার কথা ও টাকার বিনিময়ে, মেদিনীপুর শহরে ডি. আই অফিসে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় মুখে কাপড় বেঁধে তুলে নিয়ে

গিয়েছিল। তারা কোর্টে সাক্ষী দেবার ফলে প্রত্যেকের একবছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

ওনারা সাজা কাটিয়ে ফিরে আসার পর অর্ককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার ফন্দি আঁটতে থাকে। দীর্ঘদিন কেটে যাবার পর হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবুর খুব শরীর খারাপ হয়। মৌ এব্যাপারে দাদা শুভেন্দুকে ফোন করে জানায়। শুভেন্দু ফোন পেয়েই ছুটি নিয়ে হঠাৎই মধুপুরে ফিরে আসে বাবাকে দেখবে বলে।

আর সেদিনই সন্ধেবেলা শংকরদা তার লোকজন পাঠিয়ে অর্ক সেনকে খুন করতে পাঠায়। অর্ক যখন রাত্রে বাড়ি ফিরছিল ঠিক তখনই ওরা অর্ককে সবাই মিলে লাঠি এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করে। অর্ক মারা গেছে ভেবে, বাঁধের ধারে জমিতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় আততায়ীরা।

শুভেন্দু শেষ বাসে এসে নামে কানপুরে। তারপর হেঁটে আসতে গিয়ে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। সে বাড়ি গিয়ে দ্যাখে তার বাবা অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। তখন সে ব্যাগপত্তর রেখে সোজা অর্কদের বাড়ি যায়। কিন্তু রঞ্জনবাবু বলেন অর্ক এখনো বাড়ি ফেরেনি। শুভেন্দু ফিরে আসার সময় একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পায়। হাতের টর্চে আলো ফেলে দ্যাখে, তার অর্কদাকে কে বা কারা মেরে ফেলে দিয়ে গেছে।

শুভেন্দু চিৎকার করতে থাকে। গ্রামের লোকজন সবাই ছুটে আসে। সবাই দ্যাখে অর্ক সেনকে কারা মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মন্টুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে এ্যাম্বুলেন্স করে নীল নিঃশব্দে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ওখানকার ডাক্তারবাবুরা অবস্থা দেখে বললেন একে কোনো বড়ো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিয়ে যাবার জন্য যা কিছু লাগবে আমরা ব্যবস্থা কবে দিচ্ছি।

নীল নিঃশব্দে লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে অমলবাবুও এসে গেছেন। এদিকে তিয়াসা শুনে সেও ছুটে এসেছে। অমলবাবুও দেখে বললেন এক মিনিটও দেরি করা উচিত নয়। অর্ককে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে অক্সিজেন স্যালাইন চালু করে দিয়ে অমলবাবু, শুভেন্দু, তিয়াসা চলে গেল। পি. জি-তে ভর্তি করা হল অর্ককে। অমলবাবুর অনেক ছাত্র আছে এখানে যারা আজ চিকিৎসা জগতে বেশ নাম করেছে।

অমলবাবু সুপারের সঙ্গে দেখা করে বললেন সব কথা। বর্তমান সুপারও অমলবাবুব একসময় ছাত্র ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিটের ব্যবস্থা করে, অপারেশনের ব্যবস্থা করে দিলেন। সবাই খুব ভেঙে পড়েছে অর্ক সেনের যদি কিছু হয়ে যায়।

ডাক্তারবাবুরা অপারেশন করার পর বললেন রোগী এখন বিপন্মুক্ত অতএব ভয় পাবার কিছু নেই। তবে প্রায় মাস খানেক কি মাস দেড়েক থাকতে হতে পারে।

অর্ক দু-তিন বাদে কথা বলতে লাগল। তিয়াসা কেমন পাগলির মতো এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। অমলবাবু, শুভেন্দু মিলে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই সে বুঝতে চায় না। মাঝে মাঝে অর্ককে গিয়ে দেখে আসছে, আর কাঁদছে। তার কান্না দেখে সত্যিই অবাক হতে হয় অর্ক তার কে? সমাজ বলবে অর্ক তার কেউ নয় কিন্তু অমলবাবু মনে মনে বললেন, আমরা তো জানি অর্ক তিয়াসার কাছে কতখানি।

সামাজিক অনুশাসন মানতে হবে ঠিকই। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মানতে হবে, একথাও সত্যি নয়। তা যদি হত, রামী চণ্ডীদাসকে ভালোবাসত না। আর চণ্ডীদাসও রামীকে ভালোবাসতে পারত না। এদের সমাজ স্বীকৃতি দিলে সমাজের লাভ ছাড়া ক্ষতি হত না।

দেখতে দেখতে দেড় মাস কেটে গেল। অর্ক সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। যদিও এখনো পায়ে ভর দিয়ে ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারে না। তবুও সে রোজ গাড়িতে করে এসে নীল নিঃশব্দের কাজ পরিচালনা করেছে। আজ নীল নিঃশব্দের সদস্য সংখ্যা প্রায় হাজার দেড়েক। এখন সবাই মাসে চাঁদা দিয়ে যায়। আর অর্কর দীর্ঘায়ু কামনা করে যায়।

তিয়াসা এখন রোজ অর্কদের বাড়ি যায়। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া সে অর্কদের বাড়ি আর নীল নিঃশব্দে কাটিয়ে দেয়। বাকি সময়টা সে এখন অর্ককে চোখের আড়াল করতে চায় না। কিন্তু উপায় তো নেই। মনে মনে তিয়াসা তার প্রতিজ্ঞার কথাটা বারবার ঝলিয়ে নেয়। এবার আর শংকরদাকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না। এবার ওকে মরতেই হবে। অর্কর গায়ে যখন হাত দিয়েছিস তখন তোকে আমার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

মাঝখানে আবার শুভেন্দু দেওয়ালির সময় এসেছিল অর্ককে দেখতে, কিন্তু তিয়াসা ভাইকে ফোঁটা দেবে বলে আটকে দিয়েছিল। সবার উপরে মৌয়ের কথা ভেবে সে খেতে পারেনি।

ভাইফোঁটার দিন মৌ অর্ক ও শুভেন্দুকে ফোঁটা দিল। তিয়াসা শুভেন্দুকে ফোঁটা দিল। শুভেন্দু বলল দিদি তুই কি নিবি বল। তুই সত্যিই কিছু দিতে চাস? জিজ্ঞেস করল তিয়াসা।

হ্যাঁ তুই আজকের দিনে আমরা কাছে যা চাইবি তাই পাবি।

তুই ভালো করে ভেবে দ্যাখ ভাই, পরে আবার না বলবি না তো?

বলছি তো, কবার বলব বল?

তাহলে আমাকে তুই রিভলভার, পিস্তল চালনা শিখিয়ে দে।

শুভেন্দু বাধ্য হয়েই বলে, ঠিক আছে। এখানে তো হবে না তার চেয়ে এক কাজ কর দিদি, তুই একমাসের ছুটি নিয়ে শরীর অসুস্থ দেখিয়ে আমার কাছে চলে আয়। তা হলে কেউ জানতেও পারবে না আর তোর মনবাসনাও পূর্ণ হয়ে যাবে।

সত্যি ভাই তোর বুদ্ধি আছে, তা হলে তাই হবে তুই একটা ঘর দেখে রাখিস, তা হলে, তোর ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যা।

শুভেন্দু তিয়াসার ডায়েরিতে তার ঠিকানাটা লিখে দিল। কিন্তু তার পরের দিনই সে ফিরে গেল।

তিয়াসা সত্যি সত্যিই মনে মনে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে যাচ্ছিল। সে ডিসেম্বর মাসে বড়োদিনের সময় ছুটি নিয়ে চলে গেল শুভেন্দুর কাছে। সেখানে গিয়ে সে একদিনও ঘরের মধ্যে বসে কাটায়নি। কিছু অখ্যাত জায়গা সে ঘুরে ঘুরে দেখেছিল। যেমন একদিকে পিস্তল চালনার ট্রেনিং নিয়েছিল, তেমনি আর এক দিকে নদী, পাহাড় আর জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোটা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছল।

কোনোদিন হয়তো হীরামণির জঙ্গলেই সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছিল, অবশ্য ওইসব জঙ্গলে বুনো ভল্লুক ছাড়া ভয়ের কিছু ছিল না। শুধুই নদী ঝরনা, নানা ধরনের পাখি আর প্রজাপতির মেলা দেখতে দেখতে কখন যে তার সময়টা কেটে যেত সে টেরও পেত না। খিদে পেলে কিছু শুকনো খাবার আর বয়ে নিয়ে যাওয়া বোতলের জলই সম্বল ছিল।

দেখতে দেখতে একটা মাস কোনদিক দিয়ে তার কেটেছিল সে নিজেও বুঝে উঠতে পারেনি। তারপর আবার ট্রেনের টিকিট কেটে শুভেন্দুই একদিন তুলে দিয়েছিল ট্রেনে। সে শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি ধরে হাওড়াতে পৌঁছে বাসে চেপে সোজা কানপুরে এসে নেমেছিল। সে শুভেন্দুকে না জানিয়ে ওখান থেকেই গোপনে একটা পিস্তল কিনেছিল। যেটা তার সব সময় ব্যাগের মধ্যেই থাকত। আর সেই পিস্তল দিয়েই একদিন সে শংকরদাকে খতম করে দিয়েছিল। অবশ্য পরি এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করলে হয়তো সে এত সহজে পারত না।

পরিও ফুঁসছিল অর্ককে ওইভাবে মার দেবার পর থেকে। আর তিয়াসা দিদিমণিকে সে ভীষণ ভাবে শ্রদ্ধা করত। অর্ক সেনকেও সে শ্রদ্ধা করত, তাই সে তার দিদিমণিকে একদিন সব বলে দিল।

শংকরদা তাদের পাড়ায় একটা মেয়ের কাছে প্রায় প্রতিদিনই যায়। সময়টা হবে রাত এগারোটার পর। তারপর মদ-মাংস খেয়ে যখন মাতাল হয়ে যাবে তখন শালা শুয়োরের বাচ্চাটাকে খতম করে দিতে হবে। আমি তোমাকে এ-ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য করতে পারি।

একদিন রাতের বেলা পরি তিয়াসাকে নিয়ে তার বাড়ি যায়। তার বাড়িতে গিয়ে তিয়াসা, কালো প্যান্ট শার্ট এবং মাথায় কালো কাপড় দিয়ে চুলগুলোকে আঁটোসাঁটো করে বেঁধে নিয়ে কপালে একটা লাল তিলক পরে ঠিক রাত বারোটার সময় পরির ইশারায় পিস্তল হাতে নিয়ে দরজা লাথি মেরে ভেঙে সোজা শংকরদার বুকে তিনটে গুলি চালিয়ে তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারে মিশে যায়। সঙ্গে পরিও। তারপর মাঠে নেমে দৌড়োতে দৌড়োতে নিজের বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পোশাকটাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল। পিস্তলটা অবশ্য মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল পরে।

এখন সে দিব্যি স্কুলে যাচ্ছে। অর্ককে মাঝে মাঝে দেখতে যায়। কিন্তু কেমন যেন গা ছাড়া ভাব। মুখের মধ্যে যেন কাঠিণ্য লক্ষ্য করছে ইদানীং।

পুলিশ এসে শংকরদার বডি তুলে নিয়ে গেছে। জোর তল্লাশিও চলল কিছুদিন। দলের লোকেরা কিছুদিন চিৎকার চ্যাঁচামেচিও করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারল না। ঠিক যেমন শকুন্তলা আড়ি কেসটা নিয়ে পুলিশ নাড়া-চাড়া করে না। ঠিক সেভাবেই বেশ কবছর পড়ে রইল।

তারপর অর্ককে নিয়ে নানা রকম স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল মনে মনে। কিন্তু সব স্বপ্ন তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল একটা ফোনে। নীল নিঃশব্দে সুখ দুঃখের গল্প করার সময় ফোনটা বেজে উঠল। অর্ক ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, শুভেন্দু আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের এস. পি হয়ে আসছে। যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই আনন্দে ফেটে পড়ল কিন্তু তিয়াসা মোটেও খুশি হতে পারল না। অর্ক আরও বলল ও আগামী মাসের ১ তারিখ থেকে যোগদান করবে।

অর্ক তিয়াসাকে ঠাট্টা করেই বলল, কি হল মুখটা অমন আমসি হয়ে গেল কেন, ভাই আসছে পুলিশ সুপার হয়ে অথচ তোমার মুখে হাসি নেই এটা যেন

চাঁদে গ্রহণ লাগার মতন মনে হচ্ছে। অতসব বুঝিনে বাপু, কাল কিলো পাঁচেক সন্দেশ নিয়ে আসবে।

তিয়াসা বাড়ি গিয়ে খুব ভাবনায় পড়ে গেল। এবার কি হবে। সে তো খুঁজে বের করবেই, প্রথম তদন্ত করবে শকুন্তলা হত্যার কেস, তারপর কুখ্যাত শংকরদার কেস।

সত্যিই শুভেন্দু ১লা জুন যোগদান করেছে পুলিশ সুপার হয়ে। তারপর বাড়ি এসে সবার সাথে দেখা করে গেছে একদিন, তিয়াসা ভয় পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করেনি, কিন্তু দেখা না করেও উপায় নেই।

তারপর সত্যিই জনগণের চাপে শকুন্তলা আড়ির হত্যাকারীকে চিহ্নিত করল শুভেন্দু। কিন্তু তিনি খুন হয়ে গেছেন। তিনি হলেন শংকরদা। দুজন আসামি বেঁচে আছেন। কিন্তু সুস্থভাবে জীবনযাপন করছেন। যাই হোক আইন মোতবেক তাদের পুলিশ গ্রেফতার করতে বাধ্য হল।

ইতিমধ্যে একদিন তিয়াসা একাই শুভেন্দুর অফিসে গিয়ে হাজির হল এবং ভাইয়ের কাছে সমস্ত বিষয়টা স্বীকার করল। তারপর শুভেন্দু বলেছিল—তুই পুলিশের কাছে স্যারেন্ডার কর, বাকিটা আমি দেখছি কি করে কেস সাজাতে হয় আমি জানি। শুভেন্দুর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করল, তুই ১০ই জুলাই ঠিক বিকেল পাঁচটায় সময় গাড়ি নিয়ে চলে আসবি আমি পিস্তল সহ উপস্থিত থাকব।

যথারীতি জুলাই মাসের দশ তারিখ ঠিক বিকেল পাঁচটা। শুভেন্দু জিপ নিয়ে এসে হাজির হল নীল নিঃশব্দের সামনে। শুভেন্দু তিয়াসার সামনে গিয়ে বলল, শংকর বাগকে খুন করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেফতার করছি।

তিয়াসা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নে ভাই আমার এই হাত দিয়েই তো প্রতি বছর রাখি পরিয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া এই হাত দিয়েই ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলেছি ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। সেই হাতে তুই হাতকড়া পড়িয়ে দে ভাই।

শুভেন্দু দিদির হাতে হাতকড়া পরাতে গিয়ে বলল দিদি, তুই আমায় ক্ষমা করিস। আমি আইনের চাকর, আমার কিছু করার নেই! শুভেন্দু দিদির হাত ধরে গাড়ির দিকে যাচ্ছিল, অর্ক ছুটে এসে বলল, স্যার ও আজ আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে নিজে জয়ের মুকুট পরে নিল। স্যার একটু অপেক্ষা করতে পারবেন?

যদি পারেন তাহলে দাঁড়ান। অর্ক নীল নিঃশব্দের ভেতরে লুকিয়ে রাখা সিঁদুরের কৌটা থেকে এক চিলতে সিঁদুর নিয়ে তিয়াসার সিঁথিতে পরিয়ে দিয়ে বলল, আজ থেকে তুমি অর্ক সেনের স্ত্রী। এবার আসতে পারেন স্যার।

শুভেন্দু তিয়াসাকে গাড়িতে তোলার সময় দেখল, উপস্থিত সবাই কাঁদছে, এমন কি সে নিজেও।

—সমাপ্ত—